আঙুরলতা

আঙুরলতা

অর্ধবৃত্ত · যযাতি

খড়ির দাগ · জানোয়ার

শূন্য 

আঙুরলতা · বিমল কর প্রণীত



নিউস্ক্রিপ্ট · ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ · কলকাতা ২৯



প্রথম সংস্করণ। ভাদ্র, ১৮৭৯ শকাব্দ

প্রকাশক: অশোক দাশগুপ্ত

নিউস্ক্রিপ্ট। ১৭২। ৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

প্রচ্ছদপট: সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রক: রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-১৩

প্রচ্ছদপট মুদ্রক: নিউ প্রাইমা প্রেস। ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা-১৩

বাঁধাই: ইস্ট এন্ড ট্রেডার্স। ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯

দাম: ২.৭৫ টাকা

উৎসর্গ

শ্রী বীরেশ্বর বসু

মাননীয়েষু

আঙুরলতা যে-মেয়েটির নাম, সে তার নামের মধ্যেই উদ্ঘাটিত। অন্ধকার সমাজে তার বাস, কিন্তু প্রকাশ্য সমাজের অপ্রকাশ্য অথচ অনিঃশেষ প্রয়োজনের হাতে সে সব-চেয়ে বেশি নিষ্কাশিত। এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ভাগ্যের জন্যে সে দোষী করেছিল তার প্রথম সংগীটিকে, হৃদয়ের মূল্যে দেহোপজীবিকাই যার কাছে পাওনা ছিল। শ্মশানের আলোয় মানুষ সমাজ মানবিকতা মৃতস্রোত গঙ্গার শোচনীয় হাস্যকরতা তাকে বিমূঢ় করেছে। তবু সে তার মৃত সংগীর প্রতি একদা-হৃদয়-দানের অংগীকারে যথেষ্ট মানবিক; আত্মহত্যার চাইতে দুষ্ট পৃথিবীই তার বেশি উপভোগ্য। এমনি সব সমস্যার বিভিন্ন আঘাতে আলোড়িত অন্য-অনেক চরিত্র। মধ্যবিত্ত সংসারের ভার-প্রপীড়িত অন্তর্দ্বন্দ্ববিব্রত 'বিবাহবিমুখ' যুবক, যযাতির মতো নবযৌবনকামী মৃতদার প্রৌঢ়। আশ্চর্য সৎ নিরপেক্ষতার সংগে এই সব বিষমুখ সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন বিমল কর। মৌলিক ভাবে রুগ্নতা ও স্বাভাবিকতার মধ্যে মাত্রারক্ষা যে আসলে প্রায় অনির্দেশ্য, নতুন বিজ্ঞানের মতো এই মত তাঁরও গ্রাহ্য। এই বৈজ্ঞানিক অনু-ভাবনা ও নির্মমতার জন্যেই আজকের সাহিত্যে তিনি এক নতুন শক্তির মতো। 'আঙুরলতা' আজ পর্যন্ত সর্বাধিক পরিণতির সাক্ষ্যে আজকের বাংলা-সাহিত্যে তাঁর এই উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রমাণিত করবে।



আ ঙ্গু র ল তা

আঙুরলতা

মনে হল না এই মাত্র অতিবড় একটা সর্বনাশ ঘটে গেল আঙুরের—আঙুরলতার ঘরে।

হাউমাউ করে কেঁদে নন্দর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না আঙুর। দুটো ঠান্ডা পা নিজের বুকের মধ্যে দু-হাতে জাপটে ধরে মাথা ঠুকতে শুরু করল না; আধভেজান দরজাটা হাট করে দিয়ে ছুটে যে বাইরে যাবে, চেঁচামেচি করে কাউকে ডাকবে, তাও না। নন্দর চৌকির পাশে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে একটু কাঁদল না পর্যন্ত।

মধুর সঙ্গে চ্যাবনপ্রাশ মেড়েছিল আঙুর। আঙ্গুল দিয়ে নন্দর জিবে আস্তে আস্তে সেটা মাখিয়ে দিতে মানুষটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল একটু আগে। নন্দর যখন সাড়া পাওয়া গেল না, দশ ডাকেও ঠোঁট ফাঁক করল না, জিব বার করল না একটুও—আঙুর তখন তাকিয়ে তাকিয়ে লোকটার বোজা চোখের পাতা দেখল সন্দেহভরে। একটা কাল পিঁপড়ে উঠেছিল পলকের তলায়। ঘাড়টা একটু কাত্ হয়ে রয়েছে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক। সমস্ত মুখখানা সেদ্ধকরা বাসি ডিমের মতন শুকনো, শক্ত শক্ত, ফ্যাকাসে। যে-আঙ্গুলে মধু-চ্যবনপ্রাশ মাখিয়ে নিয়েছিল আঙুর নন্দর জিবে ছুঁইয়ে দেবে বলে, সেই আঙ্গুলটাই নন্দর নাকেব তলায় ধরল। না, নিশ্বাস পড়ছে না নন্দর। আঙ্গুলটা সরাতে গিয়ে নন্দর নাকের ডগার সঙ্গে ছুঁয়ে গেল। ঠান্ডা। নন্দর বুকে হাত রাখল, কান পাতল। কোনো শব্দ নেই। যাই যাই করছিল মানুষটা! আজ যাই কি কাল যাই! যাক্, শেষ পর্যন্ত চলেই গেছে।

মধু মাড়া খলনুড়িটা কুলঙ্গির মধ্যে রেখে দিতে এসে পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিল আঙুর। হিমুদের পুরনো টিনের চালার ওপর এখনও টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। মাটির দেওয়ালগুলো ভিজে সপ্‌সপ্। ডোবাটার নীল জলে শ্যাওলা থিকথিক করছে। আশশ্যাওড়া আর কচুর জঙ্গলে ক'টা কাক ভিজছে আর ডাকছে।

জানলার কাছ থেকেই ঘুরে দাঁড়াল আঙুর। নন্দর দিকে আর

একবার চাইল। নড়বড়ে সরু চৌকিটার ওপর কতকগুলো এলোমেলো হাড় যেন কেউ চিট ছেঁড়া কাঁথার তলায় চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে। দুটো মাছি এসে বসেছে নন্দর মুখে।

নন্দ তো মরে জুড়োল কিন্তু আমায় যে এই শেষ সময়েও জ্বালিয়ে গেল ! আঙুর ভাবছিলঃ এখন কি করি! কাকে ডাকি, কার পায়ে ধরি, কার কাছে হাত পাতি ?

ভীষণ রাগ হচ্ছিল আঙুরের। পাজী নচ্ছারটা যেন বুঝেসুঝেই এসেছিল এখানে। যেন ঠিক করেই এসেছিল, এ'টো পাতটা আঙুরকে দিয়েই তুলিয়ে নেবে। সেই জেদ ও রাখল।

এখন কি করে আঙুর ? এ-ভাবে তো ঘরের মধ্যে মড়া ফেলে রাখা যায় না। ওটাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার, পোড়াবার কি হবে ?

খানিকটা ভেবে আঙুর ঘরের পুব দিকের দেওয়ালের কাছে এগিয়ে গেল। তোবড়ানো রঙচটা বাক্সটার ওপর ক'টা পোঁটলা পুঁটলি গুটানো মাদুর চাপানো ছিল। তারই ওপর কালো ছিটকাটা বেড়ালটা মুখ গুঁজড়ে ঘুমোচ্ছিল।

চোখে পড়তেই আঙুর যেন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল। খপ করে ধরে বেড়ালটাকে আধভেজানো চৌকাটের দিকে ছুঁড়ে মারল। ধপ্ করে একটা শব্দ, বেড়ালটার সামান্য একটু ককিয়ে ওঠা। দরজার ফাঁক দিয়ে পালাল জন্তুটা।

যেমন করে বেড়ালটার টুঁটি চেপে ধরেছিল আঙুর, তেমন করেই মাদুর, পোঁটলা-পুঁটলি, একটা উদোম বালিশ—মেঝের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল ও। 'যত আপদ সব! আমার কপালেই জোটে গো—এও আশ্চয্যি। কেন, তোদের আর জায়গা হয় না! হারামজাদা, নচ্ছারের দল। অন্য ঠাঁই নেই ? শুতে পারিস না, মরতে পারিস না সেখানে! না থাকে রাস্তায় যা, ভাগাড়ে যা!'

আঙুরের গলা চড়ল। যখন বেশ চড়ায় উঠল—তখন আঙুর যেন থেমে গিয়ে প্রত্যাশা করছিল এইবার অন্য কেউ কথা বলবে। ম্লান বিষণ্ন, ভাঙা ভাঙা, চাপা গলায়। কিন্তু কোনো জবাব আসছে না দেখে মুখ ফিরিয়ে নন্দর দিকে তাকাতেই খেয়াল হল, লোকটা মরে গেছে।

রঙচটা, তোবড়ানো বাক্সটা খুলে বসল আঙুর। হাঠকাল, হাতড়াল। একটা পাটের ফাঁস-খাওয়া বাহারী শাড়ি বের করল, দুটো তাঁতের—

ছেঁড়া পেঁজা। সায়াও একটা, সাটিনের একটা বডিজ—। কাঠের কৌটো, প্রসাদী ফুল বাঁধা ন্যাকড়া, রোল্‌ড্‌গোল্ডের মেড়মেড়ে কান-পাশা, ঝুটো কাঁচের মালাও একটা। আর বেরুল একপাতা সিঁদুর। ক'টা মাথার কাঁটা।

আঙুর সিঁদুর আর মাথার কাঁটা ক'টা হাতে করে একটু চুপ করে বসে থাকল। নন্দর দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইল না, কিন্তু চোখ দুটো ওর মনে মনে নন্দকেই দেখছিল। বছর পাঁচেক আগেকার নন্দকে। তখন নন্দর গায়ে মাংস ছিল, হাড়টা চোখে পড়ত না। মুখটা ছিল চোখ-টানা। ভরাট গাল, বড় বড় চুল।

আঙুরের বুকের মধ্যে এতোক্ষণে টনটন করে উঠল। গলার কাছে নিশ্বাসটা একটু সময় চাপ হয়ে থাকল। চোখের সাদা জমি ব্যথা ব্যথা করে জল জমছিল। এক ফোঁটা জল একটা গাল ভিজিয়ে পড়ল টপ্‌ করে—হাতের ওপর। ঠিক কব্জির কাছটায়। আর আঙুর সে-দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাক্সের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দিল।

না, নেই। সেই শাঁখা জোড়া আঙুর কবে যেন টান মেরে খুলে ফেলেছিল হাত থেকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নর্দমায়। বিয়ের শাঁখা তো নয়, শখের শাঁখা; স্বামীর সিঁদুর তো নয়, যে-লোকটা তাকে রেখেছিল মেয়েমানুষ করে তার একচেটিয়া জবরদস্তির সিলমোহর ও-সিঁদুর। আঙুর শাঁখা ফেলে দিয়েছিল, সিঁদুরও মুছে ফেলেছিল। সে অনেকদিন হল।

চোখটা মুছে নিল আঙুর। এই যে তার মনটা খারাপ লাগছে, কান্না আসছে—এর জন্যে নিজের ওপরই তার রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এবার সে ন্যাকামি শুরু করেছে। যেন এই ন্যাকামিটুকু করা উচিত, করলে পাঁচজনে দেখবে, অন্তত নন্দ।

ঘাড় ঘোরাল আঙুর। না, নন্দ আর দেখবে না। ও মরেছে।

বাক্স হাতড়ে খুঁটে খুঁটে সবসুদ্ধ সাড়ে এগারো আনা জুটল। একটা অচল টাকা আছে। এমনই অচল যে, কোনো রকমে চালাবার উপায় নেই। যে হারামজাদা ফাঁকি দিয়ে এটা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল —সে আর কোনোদিন এল না। এলে আঙুর তার কাছ থেকে টাকাটা ঠিক আদায় করে নিত। ঠাকুর বাড়িতে মানুষ অচল চালায় আর চালা-

বার চেষ্টা করে তাদের এই পটিতে।

সাড়ে এগারো আনা—আর আঙুর মনে মনে খুঁজে-পেতে দেখল, কুলুঙ্গিতে গেলাস চাপা দেওয়া একটা আধুলি আছে, দোক্তার কৌটার মধ্যে একটা দুয়ানী। ও, হ্যাঁ—আর আনা ছয় পয়সা আছে চালের হাঁড়িটার মধ্যে। কতো হল সবসুদ্ধ তা হলে! সেই একটাকা সাড়ে এগারো আনা।

একটাকা সাড়ে এগারো আনায় কি একটা লোককে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, পোড়ান-টোড়ান সম্ভব! আঙুর যদিও এমন ফ্যাসাদে আগে পড়ে নি তবু জানা কথাই গোটা দুয়েক টাকায় শ্মশান-খরচ চলে না।

কি করবে, কি করা যায়—আঙুর ভাবছিল। কুল পাচ্ছিল না। বিক্রি করবে, বাঁধা রাখবে—এমন কোনো জিনিসই আর তার কাছে নেই। কি আছে আর তার এখন? এক রতি সোনা না, রুপো না, এমন কি কাঁসাও নেই। সোনা কোনোকালেই ছিল না! সোনার পাত পরানো হালকা চুড়ি চারগাছি ছিল এককালে, নন্দই করিয়ে দিয়েছিল তখন, সে-চুড়ি কবেই গেছে। কানের দু-তিন আনা সোনা ছিল—এটা অবশ্য আঙুর তার রোজগারে গড়িয়েছিল—সেটাও গেছে মাসদেড়েক আগে নন্দ আসার পর।

নন্দ এল, আর যেন মস্ত বড় হাঁ নিয়েই হারামজাদা এসেছিল, আঙুরের কানের তিন আনা সোনা গেল, খাঁটি সোনা; নাকের দেড় আনা—মাথায় গোঁজা রুপোর চিরুনিটা, দু'খানা রেশমী শাড়ি, কাঁসার থালা, বাটি, গেলাস—টুকিটাকি আরও কতো কি!

কি করবে আঙুর! আহা, সে কী সেধে এনে ঘরে ঢুকিয়ে চৌকি পেতে দিয়েছিল! অত পিরীতের কেষ্ট ছিল না নন্দ তার। বরং ওই ছ্যাঁচড়া, শয়তান, ইতর, স্বার্থপর লোকটা যখন ধুঁকতে ধুঁকতে এসে উঠল, আঙুর তো তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে গিয়েছিল।

মুখপোড়া মাগীচাটা তখন আঙুরের পা জড়িয়ে ধরে মেয়েমানুষের মত কেঁদেছে। আঙুরের নিজেরই তখন ঘেন্না করছিল। নন্দর সর্বাঙ্গে ঘা, পুঁজরক্তে ময়লা ছেঁড়া কাপড়জামা দাগ ধরে কড় কড় করছে; বিকট গন্ধ—দাঁতে পোকা, চুলে উকুন, একমুখ দাড়ি, হলুদ চোখ। আর বৈশাখ মাসের দুপুরের খড়ের গাদার মতন গরম গা। 'দুটো রাত আমায় থাকতে দাও, আঙুর; গায়ের তাপটা একটু কমুক

আমি চ'লে যাব।' নন্দ বলেছিল আঙুরের পা সত্যি সত্যি জড়িয়ে ধরে।

'না, না, না। যেখানে কাটালে এতোদিন—সেখানে যাও।' আঙুর রোদজলে পোড় খাওয়া কাঠের মত শক্ত। 'তোমার পয়সার সুখ যারা লুটেছে, যাদের পায়রা করে পুষেছ এতোদিন, শোয়াশুয়ি রঙ্গ করেছ, —তাদের কাছে যাও। কেন, তারা এখন রাখল না, লাথি মেরে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিল!'

নন্দ জবাব দিতে পারছিল না। তার জবাব দেবার কিছু ছিল না। শুধু জ্বরের ঘোরে, যন্ত্রণার বিকারে একটা মারাত্মক জখম-হওয়া-কুকুরের মতন ছটফট করছিল, মাথা খুঁড়ছিল।

আঙুর থাকতে দেবে না। নন্দও উঠবে না। ওঠার মতন ক্ষমতা-টুকুও তার নেই যেন।

অগত্যা।

'থাক্‌ছ, থাক—; কিন্তু জ্বর ছাড়লেই চলে যেতে হবে।' আঙুর সাফসুফ বলে দিয়েছিল, শাসিয়ে দিয়েছিল। সেই গোড়াতেই।

নন্দ তো জ্বর ছাড়াতে আসে নি, এসেছিল আঙুরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্‌ করতে। কী ঝামেলা, কী ঝকমারি নন্দকে থাকতে দিয়ে। জ্বর তো যায়ই না, উপরন্তু বাড়ে। মাঝে মাঝেই নন্দ বেহুঁশ। হুঁশ থাকে যতক্ষণ কাটা ছাগলের মত ছটফট করে।

চোখের সামনে জবাই আর কতক্ষণ দেখতে পারে মানুষ। আঙুর বিরক্ত হয়ে, কোনো উপায় নেই দেখে, নন্দকে গালাগাল দিতে দিতে ডাক্তাব ডেকে আনল। অম্বিকা ডাক্তারকে। এ-পাড়ার ডাক্তার। যার কাছে আঙুরদের লুকানো-চোরানো রোগগুলো জলের মতন পরিষ্কার। ও জ্বালা-টালা,ঘা-টা আপাতত সে চাপাচুপি দিয়ে দিতে পারে।

অম্বিকা ডাক্তার দেখল নন্দকে। আঙুরকে বলল, 'ও আঙুর—খারাপ ঘা-টাগুলো না হয় একটু সারিয়ে-সুরিয়ে দিলাম আমি; কিন্তু ওর লিভার যে পচে গেছে মদ খেয়ে খেয়ে। বড় কাহিল অবস্থা। সহজে মেরামত হবে না। হবে কি না তাও সন্দেহ! ওকে বরং কলকাতার হাসপাতালে দাও, যদি কিছু হয়—এখানে তো সুবিধে দেখছি না।'

আঙুরকে যেন কেউ উনুনের আঁচ থেকে টেনে চুল্লিতে ফেলল।

জ্বলে যেতে লাগল আঙুর। কোথায় আপদ বিদেয় করতে পারলে বাঁচে তা না নাড়িভুঁড়ি পচিয়ে, ফিচিল রোগে সমস্ত রক্তটাকে দুষিয়ে হারামজাদা তার কাছে আরাম করতে এসেছে।

মর, মর। অরুচি আমার। খেলাম, শুলাম, সুখ করলাম পাটে; ছাই ঝাড়তে ওরে পচি, এলাম তোমার হাটে। বেইমান মিনসে কোথা-কার! হবে না, শরীর তো পচে পচে গলে গলে ঝরবে। প্রায়শ্চিত্যি এমনি করেই হয়। কেন, যখন আঙুরকে ছেড়ে পথে বসিয়ে পালিয়ে-ছিলে মনে ছিল না। আমার মা না হয় পা পিছলে কাদায় পড়েছিল। কিন্তু আমি তো আর সাত ভাতার করে বেড়াই নি। তখন ফুসফাস করে ভাগিয়ে নিয়ে এলে। কতো রস-আদিখ্যেতা, মধুমিছরি কথা—।

আঙুর তখন বড্ড মিষ্টি, রস টুসটুসে। একাই চাখব, একাই খাব। ফন্দি-ফিকির, ছেনালি কত! শাঁখা পর, সিঁদুর দাও সিঁথিতে। বর-বউ; স্বামী স্ত্রী আমরা। ভগবান সাক্ষী, যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, এই মাটি সাক্ষী, এই ঘরের চুন, দেওয়াল-ছাদের বন্ধন—এরা সাক্ষী।

বছর কাটতেই আঙুরের রস শুষে শুষে ছিবড়ে করে ফেলল নন্দ। আর সুখ নেই, স্বাদ নেই, অরুচি ধরে গেছে। পালাল নন্দ। কিছু না বলে, ঘর-দেওয়ালের বন্ধন কাটিয়ে। তারপর চার বচ্ছর আর এ-পথ মাড়াল না। আজ এসেছে—মরতে বসে যখন আর কোথাও জায়গা পাচ্ছে না দেহটা রাখে।

আঙুর চিৎকার করে করে শুনিয়ে শুনিয়ে এ-সব কথা দশবার করে বলে। দূর দূর করেই আছে। জিবের রাখঢাক নেই। সারাদিন বিরাগ আর বিরক্তি, রাগ-ঘেন্না উগরে যাচ্ছে।

অথচ নেহাতই যেন এমন এক কলে পড়েছে যেখান থেকে উদ্ধাব নেই তার লোকটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত—তাই ভীষণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পাপ বিদায়ের গুণাগার দেবার জন্যেই ডাক্তার আর ওষুধ আর এ-পথ্য সে-পথ্য।

অম্বিকা ডাক্তার ক'টা ছুঁচ ফুঁড়ল, দু-চার শিশি ওষুধ। ঘা ফোড়ার দগদগানি কমল একটু। আর কিছু না। চটকলের সেই বড় ডাক্তার—তাকেও একদিন দেখিয়ে আনল আঙুর। তার লিখে দেওয়া ওষুধ খাওয়াল। যে কে সেই। এই ডাক্তারও বলল, কলকাতার হাস-পাতালে ভর্তি করে দিয়ে এস।

বিশ মাইল কলকাতা। যেতে আসতে চল্লিশ মাইলের রগড়ানি, রেল-ভাড়া, বাস-ভাড়া। নন্দর ওঠার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু আঙুর একটা পচাগলা মাছের চেঙারির মতন নন্দকে কাঁখে-কোমরে ধরে তাও কলকাতার দু-দুটো হাসপাতালে ধরনা দিল। কিসের কি, কানে কথাই তুলল না কেউ। দেখলনা পর্যন্ত। এক নজর চেয়েই বলল, এখানে কেন এসেছো গো, নিমতলায় নিয়ে যাও। আর যদি আঁচলে নোট বেঁধে এনে থাক—টাকা দিয়ে ভর্তি করে দিয়ে যাও।

ফেরার পথে নন্দর সঙ্গে হাসপাতালেরও বাপান্ত করতে করতে ফিরল আঙুর। আর সেই যে এসে পড়ল নন্দ তারপর আর পাশ ফের-বার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকল না। হোমিওপ্যাথি চলছিল শেষটায়। তবু দু'আনা পুরিয়া পাওয়া যায় কালীকেষ্টর ডাক্তারখানায়। গত পরশু থেকে সত্য কবিরাজের কথা মতন মধু-চ্যবনপ্রাশ।

তারও শেষ হল। নন্দ মরল।

আঙুর রঙচটা তোবড়ানো ডালা খোলা বাক্সর অন্ধকারে বেহুঁশ হয়ে তাকিয়েছিল। চোখের পাতা পড়ছিল না, মনেই হচ্ছিল না ও আছে, ও কিছু ভাবছে, কিছু ওর করার আছে।

হুঁশ হল মেঘের ডাকে। খুব জোরে একটা মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। আঙুর মুখ ফিরিয়ে দেখল, জানলার বাইরেটায় অনেকটা অন্ধকার জমে এসেছে।

বাক্সটা থেকে পাটের বাহারী শাড়িটা বের করে ডালাটা বন্ধ করে দিল। জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকাল বাইরে। খানিকটা কালো মেঘ জমেছে বলে মনে হচ্ছে—কিন্তু বিকেলও হয়ে গেছে। বৃষ্টি অবশ্য আর পড়ছে না।

আঙুর শুনতে পাচ্ছিল তার ঘরের বাইরে চাঁপা, আতা, লাবণ্য, চামেলি, গোলাপ—দুপুরের গা-গড়ানো ঘুম শেষ করে, কেউ জল ভরতে, কেউ হাই তুলতে, উড়ের দোকান থেকে চার পয়সার চা আনতে—উঠোন দিয়ে আসছে যাচ্ছে, কথা বলছে। আতার কিরকিরে গলা আর গোলা-পের ভাঙা গলার বিশ্রী হাসিটা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিল আঙুর।

আতা ছুঁড়িটার কপাল ভাল। পাটকলের একটা ছোঁড়া খুব যাচ্ছে আসছে। আগেরটা ভাগতে না ভাগতেই নতুনটা জুটে গেছে। আঙুর ভাবছিল ঃ আতা কি এই পাটের বাহারী শাড়িটা নেবে? ওর তো এই

সব রঙ, বাহার ভালই লাগে। যদি নেয় আতা, হোক না একটু ফাঁস খাওয়া—তবু এখনও ছ'টা মাস নিশ্চিন্তে পরতে পারবে। আহা, এই শাড়ি পরে তো আর বিছানায় ধামসাচ্ছে না!

যদি নেয়, আঙুর চার টাকাতেই দিয়ে দেবে। আর যদি না নিতে চায়? আঙুরের মনের মধ্যে আতা, পাটের শাড়ি, নন্দ সব এলোমেলো হয়ে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুর যেন সব ভেবে নিল, পর পর। কি করবে, কার কাছ থেকে কার কাছে যাবে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে এবার। বিকেল তো হয়েই গেল। আর কতক্ষণ ঘরে মড়া ফেলে রাখবে!

যাবার সময় নন্দর মুখের দিকে চেয়ে একটা কুৎসিত গাল আওড়াল আঙুর। বাইরে এসে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল।

আতা তার ঘরের কাছটিতে পিঁড়ি পেতে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। নিশ্চয় ওর বাবু কাল যাবার সময় ফেলে গেছে। কিংবা আতা সরিয়ে রেখে দিয়েছে নিজেই। সেই সিগারেটের ভাগ পাবার আশায় মানদা আতার চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছে, চিনু পায়ের কাছটিতে উবু হয়ে বসে ঝামা দিয়ে পা ঘষে দিচ্ছে।

পাটের শাড়িটা আঁচলের তলায় আড়াল করে নিয়েছিল আঙুর আগেই। আতার আশেপাশে অত ভিড় দেখে এখন আর যেতে ইচ্ছে হল না। মানদা যতক্ষণ কাছে থাকবে, শত খুঁত বের করবে, আতার ইচ্ছে থাকলেও মানদা কিনতে দেবে না। দর-দাম তো পরের কথা।

তার চেয়ে আগে হিমুর কাছেই যাওয়া যাক। বলতে গেলে হিমুই একমাত্র লোক যার সঙ্গে আঙুরের ভাবসাব আছে ভাল মতন। সুখ-দুঃখের কথা তার সঙ্গেই যা হয়। এত বড় বিপদের কথাটা তাকেই আগে জানানো দরকার।

আঙুর উঠোন পেরিয়ে তর তর করে সদর দিয়ে বাইরে চলে গেল। হিমুদের চালাটা পাশে।

চুল বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল হিমু। আঙুর এসে কাছে দাঁড়াল।

বিপদের কথাটা বললে আঙুর। হিমুর হাত থেমে গিয়েছিল। 'কখন ম'ল?'

'দুপুরে।'

'ঘণ্টা তিন চার হল তবে! আজ আবার শনিবার। দোষ না পায়!'

'পাবে পাক, আমি কি করব! আমার কাছে তো চিতেয় ওঠার খরচ জমা রেখে যায় নি!'

'কি করবি?' হিমু চুলের খোঁপাটা আবার গুছোতে শুরু করল।

'ক'টা টাকা যোগাড় করতে পারলে হারামজাদাকে চিতেয় উঠিয়ে আসব।' আঙুর দাঁতে দাঁত পিষে বলল।

'বিশুদের কাছে যা। ওদের বল। তবে মাগনায় মরা কাঁধে করে পোড়াতে যাবে না ওরা।'

'তা জানি।'

'দেখ্ তবু হাতে-পায়ে ধরে—যদি যায়।'

আঙুর তাকিয়ে তাকিয়ে হিমুর মুখ দেখল। হিমুকে দেখে মনে হচ্ছে, এ-ব্যাপারে তার কোনো গা নেই।

'তুই আমায় ক'টা টাকা দিবি হিমু?'

'টা—কা!' একটুক্ষণ আঙুরের দিকে চেয়ে থেকে হিমু হতাশ, বিষাদ-বিষাদ মুখ করল, 'তোকে বলছিলাম না সে-দিন! স্যাকরার জন্যে বারোটা টাকা রেখেছি অনেক কষ্টে, আর চারটে হলে—জিনিসটা হয়। তা পোড়া কপাল এমন চারটে টাকাও জুটোতে পারছি না।'

আঙুর হিমুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

কি ভেবে হিমু বললে আবার, 'সিকি, আধুলি, বড় জোর টাকাটা হয়, পারি আঙুর। তার বেশি আমাদের ক্ষমতা কি! তা তুই দুটো টাকা নে বরং আমার কাছ থেকে। পরে শুধে দিস।' বলেই হিমু একটু অন্য রকম হাসল, 'তুই আর শুধবি কি—!'

হাত পেতে আঙুর দুটো টাকাই নিল। অন্য সময় হলে নিত না, কিছুতেই না।

হিমুর কাছ থেকে বেদানামাসির ঘরে।

মাসি শুনে খেঁকিয়ে উঠল, 'তখন বলেছিলাম ও আপদ ঝেড়ে ফেল গা থেকে। শুনলি না। দরদে একেবারে উথলে উঠলি। যা এবার নিজেই কাঁধে করে নিয়ে যা। ছেনাল মাগী কোথাকার।'

আঙুর কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল শুধু, দরদেও উথলে

উঠি নি, বিছানা পেতেও শুতে দিই নি। নন্দর আমি বিয়ে করা মাগ নয় যে, না খেয়ে সেবা-শুশ্রূষা করেছি ওই পচা মর-মর লোকটার। নেহাত ছিল, একই ঘর; ও চৌকিতে, আমি মেঝেতে; তাই জল চাইলে দিয়েছি, ওষুধটা ঢেলেছি মুখে। পথ্যটা দিয়েছি দায়ে পড়ে।

বেদানামাসি বললে, 'আমি কি করব!'

'মড়াটা ঘরে পড়ে থাকবে?' আঙুরের গলা যেন আর উঠছিল না।

'তা থাকবে বৈকি—আমার এখানে মড়া ধরা না থাকলে, না পচলে তোদের চলবে কেন! যা—যা—মেথর মুদ্দোফরাসকে খবর দিগে যা—হাতে আধুলিটা টাকাটা গুঁজে দিস—না হয় একদিন নিয়ে শুস বিছানায়—ওবাই ধড়টাকে পা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দেবে।'

আঙুরের বুকটা ছ্যাঁক করে উঠল। মেথর, মুদ্দোফরাস! জিনিসটা কল্পনা করতে গিয়ে মনে পড়ল, মরা কুকুরকে কিভাবে পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায় ওরা।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল নন্দর উপাধিটা। ও চক্রবর্তী। বামুন।

কেমন যেন শিউরে উঠল আঙুর। বুকের মধ্যে সত্যি সত্যি একটা অদ্ভুত ব্যথা আর অসহায়তা জমে উঠতে থাকল।

বিকেল পড়ে সন্ধ্যে হয় হয়।

আঙুর তাড়াতাড়ি এল আতার ঘরে। আতা তখন সাজছে। ছেঁড়া সায়ার ওপর আর একটা নতুন লাল সায়া চড়িয়েছে। তা কোমর-টোমর ফুলেছে খুব। বডিজ এঁটে শাড়িটা সবে পরছে। ঘরে কেউ নেই।

কথাটা সরাসরি পাড়ল আঙুর। পাটের শাড়িটা একেবারে বের করে।

আতা দেখল হাতে নিয়ে, খুলে ফেলে, কোমরে পাক দিয়ে, গায়ে ফেলে। 'শাড়িটা তোমার বড্ড সেকেলে, আঙুরদি! পাড় ভাল না।'

আঙুর কি বলবে! তিন বছর আগের শাড়ি সেকেলে হয়ে গেছে! আঙুর শুধু বিড়বিড় করল, 'তোকে মানাবে। বেশ মানাবে।'

আতা হাসল। 'চারুবাবু সে-দিন আমায় একটা ছাপাই এনে দিয়েছে। এ-নিয়ে আর কি করব! বড্ড পুরোনো ছেঁড়া ফাটা।'

'নে না—!' আঙুর নিজের অজান্তেই কখন যেন মিনতি করে বসল, 'আমি বলছি আতা, নিয়ে নে। তোকে সুন্দর দেখাচ্ছে শাড়িটা গায়ে

ফেলে। আরি যদি শুনিস বাপু তবে বলছি,—এ-শাড়ি পরে তো আর ধামসাচ্ছিস না। রেখে রেখে পরিস—বছর খানেক চলে যাবে।'

আতা ভাবল। 'আমার কাছে তিনটে টাকা আছে—আড়াইটে টাকা দিতে পারি। না হলে তুমি নিয়ে যাও, আমার তেমন দরকার নেই।'

আড়াইটে টাকাই নিল আঙুর। ঘরের বাইরে এল। লণ্ঠন আর কুপি জ্বালিয়ে ঘরে ঘরে সব তৈরি। সাজ-পোশাক শেষ করে ফেলেছে চামেলি, লাবণ্যরা। আকাশ লালচে লালচে, বৃষ্টি হয়ত আরও জোরে আসবে। টিপটিপ পড়তে শুরু করেছে আবার। সেই বৃষ্টিতেই চামেলিদের কেউ মাথার ওপর আঁচল তুলে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটি ছাতায় দু-তিনটে মাথাও জড়ো।

সরু গলিটা দিয়ে রাস্তায় চলে এল আঙুর। গলির আবছা আলো-অন্ধকারে তখন গোলাপদের জটলা, বিড়ি ফোঁকা, গা-ঢলাঢলি, হাসি। ঘুর ঘুর শুরু হয়েছে সবে খদ্দেরদের।

রাস্তায় এসে মনে মনে টাকার পুরো হিসেবটা সেরে ফেলল আঙুর। এক টাকা সাড়ে এগারো আনা, হিমুর দুই আর আতার আড়াই—তা ছ'টা টাকা হয়ে গেছে। বিশুরা যদি এখন এই ছ'টাকায় রাজী হয়। মনে হয়-না হবে—। কতোতে যে হবে—তাই বা কে জানে! হন হন করে এগিয়ে গেল আঙুর।

এখান ওখান খোঁজ নিয়ে বিশুকে পাওয়া গেল সাইকেল সারাবার দোকানটায়। টিনের নড়বড়ে চেয়ারে বসে দোকানের দরজার পাল্লায় পা তুলে কাঁচের গেলাসে চা খাচ্ছিল। কার্বাইডের আলো তার পাজামা আর মুখে পড়েছে।

আঙুর কাছে গিয়ে ডাকল। ইশারা করল কাছে আসবার।

চা শেষ করে, বিড়ি ধরিয়ে ফুঁকতে ফুঁকতে বিশু এল; মিটমিট চোখে চারপাশ দেখতে দেখতে। 'কি রে পটলি, কি খবর?' বিশুর কাছে আঙুররা সবাই পটলি। কিন্তু আঙুর কিছু বলবার আগেই বিশু সামনের দিকে চেয়ে বলল, 'দাঁড়া, আগে মাইরি একটা পান খেয়ে লি। শালা চা নয় তো যেন ঘোড়ার পেচ্ছাপ। জিবটাই বেসাদ হয়ে গেল।' বিশু কথাটা শেষ করেই হাত বাড়াল। অর্থাৎ পান সিগারেটের পয়সাটা আগে ফেল। পরে বাতচিত।

আঙুর এ-সব দস্তুর জানে। গরজ তার। আঁচলের খুঁট থেকে আধুলিটা দিল—আতার দেওয়া আধুলিটা। বললে, এক খিলি পান, একটা সিগারেট—তার বেশি নয়, কালীর দিব্যি থাকল্।'

বিশু হাসল। 'খুব টাইট যাচ্ছে না কিরে পট্‌লি! দিনকাল শালা যা যাচ্ছে—যেন সত্যযুগ। আয়—হায়, শালা আঙুরের রস চাটবে তাও মাছি আসে না।' বিশু হাসতে হাসতে চলে গেল।

এল খানিক পরে, জোড়া খিলি পানে গাল ভরতি করে, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। পয়সা কিন্তু ফেরৎ দিল না। 'বল পট্‌লি কি বলছিলি ?'

আঙুর বলল সব। গলায় উদ্বেগ আর মিনতি।

বিশু রাস্তার ছিটে ফোঁটা আলোতে আঙুরের মুখটা ভাল করে দেখল। একটু ভাবল, 'ক'টাকা আছে তোর কাছে ?'

'ছ'টাকা।'

ছ'টাকা। ছ'টাকায় কি হবে রে, একটা ঠ্যাং-ও তো পুড়বে না নন্দর।' হো হো করে হেসে উঠল বিশু।

'কতো লাগবে তবে ?' আঙুর বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে বিশুর অট্টহাসি শুনতে শুনতে শুধলো।

'দেড় টাকা মণ আম কাঠ। তা মণ সাতেক লাগবে। দশ টাকা তো তোর কাঠেই লাগবে; তাবপর হাঁড়ি কড়ি ধুনো—ধর আরও এক টাকা। নতুন বস্‌ত্‌র পরাতে চাস তো—'

'না।' আঙুর তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। ওর বুক শুকিয়ে আসছিল। নতুন বস্ত্রে আর দরকার নেই।

'এইতো আর কি; আর আমরা চারজন যাবো চারটে পাঁইট দিবি। তা দু'নম্বরই দিস—দু'টাকা ছ'আনা করে ধরে নে—গোটা দশেক টাকা আর কি!'

আঙুরের পায়ের সাড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, হাতেরও। বিশুর মুখটা পর্যন্ত শুয়োরের মতন ছুঁচলো ঘিনঘিনে দেখাচ্ছিল।

খানিকটা সময় লাগল আঙুরের সইয়ে নিতে। বললে, 'অতো টাকা আমি কোথায় পাব? আমার বাপ না ভাতার যে তাকে পোড়াতে বিশ টাকা খরচা চাইছিস ?'

'বাপ না, ভাতার না,—তো সেরেফ চেপে যা। থানায় গিয়ে খবর

দিয়ে দে [illegible] ঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

আবার সেই ধাঙড়! বুকটা ধক্ করে উঠল। আঙুর নিরুপায় হয়ে বলল, 'আমার খেমতা থাকলে বিশই দিতাম। চামারগিরি করিস না বিশু!'

'তুই মাইরি, অকারণে বিগড়োচ্ছিস, পটুলি! এই বৃষ্টি বাদলার দিন—এখন শালা শ্মশানে যেতে হলে পেঁচো, বীরে, কেলো—তিন শালাকে খুঁজে বের করে ধরতে হবে। মুফতি কেউ যেতে চাইবে না। অন্তত গায়ের পায়ের ব্যথাটা মারবার খরচা দিবি তো। আচ্ছা যা, দুটো পাঁইটই দিস—তোর বাপ ভাতার যখন নয়—এক রকম মাগনাতেই চিতেয় উঠিয়ে দেব। আর কিছু বলিস না মাইরি, তোর পায়ে পড়ি।'

আঙুর হাঁ হুঁ কিছু বললে না। মাথা নাড়ল না। সায় দিল না। রাস্তার আলো শোষা অন্ধকার, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর বিক্ষিপ্ত লোক-জন, দোকানপাটের দিকে নির্জীবের মতন চেয়ে থাকল।

বিশু বললে, 'যা শালা, কাঠ না হয় পাঁচ মণের মধ্যেই সেরে দেব। বাপ, ভাতার কিছুই নয় যখন তোর—আধপোড়া হলেও ক্ষতি নেই। টান মেরে গঙ্গায় ফেলে দিলে হবে। আরও গোটা ছ'সাত টাকা যোগাড় করে ঝপ করে আয় দেখি, পটুলি। আমি হাঁদুর দোকানে আছি।'

বিশু চলে গেল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। আরও সাতটা টাকা সে কোথায় পাবে, কার কাছে হাত পাতবে!

ফিরতে লাগল আঙুর। যেন ভীষণ জ্বরে তার সর্বাঙ্গ অবশ, অচেতন। কিছু আর দেখতে পাচ্ছে না, ভাবতে পারছে না।

যাক, মেথর মুদ্দোফরাসেই টেনে নিয়ে যাক নন্দকে, টেনে নিয়ে গিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিক গে। কি করবে আঙুর, কি আর সে করতে পারে! নন্দর ওপর তার এত বেশি রাগ হচ্ছিল যে, লোকটাকে যদি বাঁচা অবস্থায় পেত, আঁচড়ে কামড়ে মেরে-ধরে কুরুক্ষেত্র করত আজ। মরেও আমার হাড়মাস জ্বালাচ্ছে গো! আর এ কী অসহ্য জ্বলন! আঙুরের কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

বড় রাস্তা ধরে আবার তাদের পটির কাছে এসে পড়ল প্রায় আঙুর। আসবার সময় চোখ রেখে আসছিল, যদি তেমন কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যার কাছে একটা দুটো টাকা হাত পেতে চাওয়া চলে।

লোক তো অনেক যাচ্ছে আসছে। কিন্তু ওরা কেউ আঙুরের

আঁচলে টাকা ছুঁড়ে দেবে না মুফতিতে। না, নন্দ [illegible]র চিতের ওঠা হল না। হবে কোথা থেকে? অমন ঠগ, জোচ্চোর, শয়তান মানুষের কি আর দাহ হবার পুণ্য আছে। একে বলে প্রায়শ্চিত্য। বামুনের ছেলে—এবার মেথর ধাঙড়ের হাতে যা, যেমন করে কুকুর বেড়াল যায়, তাও আবার কোন ভাগাড়ে যাবি কে জানে!

আঙুরের ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছিল। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্, করছে, শিরদাঁড়াটা যেন মাঝখানে মচকে যাবে। চোখের সামনে সব ঝাপসা ঝাপসা—অদ্ভুত!

হল না। আর হল না। একটা মানুষ মরল; তার দাহ হল না। কেউ সে-দায় নিল না। কেন নেবে? নন্দ তাদের বাপ, ছেলে, স্বামী, ভাই—কেউ না।

হঠাৎ মানিকবাবুর সঙ্গে দেখা। হনহনিয়ে ছাতা মাথায় চলেছে। আঙুরের কি যে হল, প্রায় ছুটে গিয়ে মানিকবাবুর পথ আগলে ফেলল।

মানিকবাবু চিনতেই পারলে না। কে? কি চাও? আঙুরকে দু' হাত তফাতে রেখে মানিক মুন্সী যেন এ-পটির মেয়ের ছোঁয়া বাঁচাচ্ছিল।

আঙুরের অত আর দেখবার সময় নেই। গড়গড় করে বলে গেল আঙুরঃ 'আপনি বাবু, একদিন এসে আমাদের ভোট কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দাড়িবাবুর জন্যে। বলেছিলেন, আপদ-বিপদ সুখ-সুবিধে দেখবেন। আজ আমার বড় বিপদ। ঘরে মড়া পড়ে পচছে, পুড়োতে পারছি না। একটা ব্যবস্থা করে দিন বাবু। অন্তত দাড়িবাবুর ঠেঙে চেয়ে সাতটা টাকা দিন।

মানিক মুন্সী খিঁচিয়ে উঠল, 'আহা—কী আমার আব্দার রে মাগীর! টাকা দিন। কেন, দাড়িবাবু তোমায় টাকা দেবেন কেন? তোমার ঘরে লোক মরবে আর মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বারবাবু তাকে খরচা করে পোড়াবে! যাও, যাও,—ওসব আব্দার রাখ। দাড়িবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, কিছু বলতে হয়, কাল বেলা দশটার পর অফিসে যেও।

মানিক মুন্সী চলে গেল। আঙুর থ। কাল বেলা দশটা! মানুষ মরল আজ দুপুরে, তার দাহের জন্যে পা ধরতে যেতে হবে কাল বেলা দশটায়! আর সারা রাত ভরে তার ঘরে মড়াটা পচুক!

আঙুর বুঝতে পারছিল, দায়টা আর কারুর নয়—তারই। দায়ের

সময় মানিক মুন্সী। তাদের বেশ্যাপট্টির ঘরে ঘরে ঘুরেছে, পান মিষ্টি খেতে জনে জনে টাকা দিয়েছে। আজ তার দায় নেই।

চোখ ফেটে কান্না আসছিল আঙুরের।

কিন্তু কাঁদল না আঙুর। চোখ পড়ল সামনের দোকানটায়। পানের দোকানের মত এক ফালি দোকান। রাস্তার সঙ্গে মেশান নীচের দোকানটায় বসে মুড়ি, ছাতু-টাতু বিক্রি করে একজন। ওপরটায় অন্য জনের দোকান। আয়না দিয়ে সাজানো। হরেক রকম শিশির থাক। আতর, জর্দা, সুর্তি আর সুর্মার সঙ্গে মোদকও বিক্রি হয় ও-দোকানে।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে দেখতে আঙুরের দু'টো চোখ হঠাৎ কিসের আঁচে যেন জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, লোকটাকে ভাল করেই চেনে আঙুর। ওর নাম প্রভুলাল। আর এও জানে আঙুর ওকে দেখলে প্রভুলালের শরীরটা কেমন কিলবিল করে ওঠে। যেন জ্বর লেগে যায়। দাঁত, মুখ, চোখ, গা—সব যেন কসকস করে, কাঁপে ভেতর ভেতর, টসটসিয়ে ওঠে। তখন লোকটার একটা চোখ চকচক করে, ভীষণ চক-চক, আর অন্য চোখটা—যেটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, ঝুলে পড়েছে, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা, সবুজ—সেটা যেন আরও কুচ্ছিত হয়ে ওঠে। প্রভুলালের কালো কুচকুচে ফোলা ফোলা মুখ থেকে দাঁতগুলো তখন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। জিব দিয়ে লালা পড়ে।

আঙুরের দিকে প্রভুলালের নজরটা বরাবরই এইরকম। কেন, কে জানে। আঙুর বুঝতে পারে না। এক একটা লোকের এক একজনের ওপর এ-রকম হয়। দাঁত উঁচু, টোপা-কপাল ঝুমুরের ওপর তা না হলে অমন সুন্দর মানুষটার চোখ পড়ে। মণ্টুবাবুর। মণ্টুবাবু তো ঝুমুরকে এখান থেকে উঠিয়েই নিয়ে গেল।

আঙুর জানে, তার রূপ ঝরে গেছে। অমন ব্যাধি থাকলে না ঝরে উপায় নেই। আর ব্যাধির কি ঠাঁই বিচার আছে। এমন জায়গায় গুছিয়ে বসল যে, আঙুরের আসলটাই গেল। অম্বিকা ডাক্তার বলেই দিয়েছিল, খুব সামলে সুমলে থাকবে। বেশি অত্যাচার করো না। ছেড়ে দিতে পারলেই ভাল। নয়ত একদিন এতেই মরবে।

সেই থেকে আঙুরের অবস্থা পড়ে গেল। নয়ত আতা, চিনু, চামেলির বড়মুখ ওকে সইতে হত না। ঈশ্বর যাকে মারেন— তার আর উপায় কি! তাও একটা বছর আঙুর কত সাবধানে থেকেছে। নেহাত

যখন পেট ভরাবার চালডালটুকুই বাড়ন্ত হত—তখনই আঙুরকে গলির মুখে এসে দাঁড়াতে হত সেজেগুজে।

রোগটা ভেতরের—তাই ওপরটায় আজও আঙুরের কিছু কিছু আছে। মুখখানাই শুধু যে ভাল তা নয়; বুক কোমর চলন টলনগুলোও এখন পর্যন্ত ভাল আছে। বিশেষ করে সামনাসামনি দেখলে—আঙুরেব এই আশ্চর্য ভরাট গলা-ঘাড়-বুকের দিকে না চেয়ে পারা যায় না।

প্রভুলালের দোকানের দিকে পা পা করে এগিয়ে যেতে লাগল আঙুর। লোকটাকে কী ঘেন্নাই করত ও; প্রভুলালের কালো কুচকুচে, থলথলে মোটা, ভোঁদড়ের মত শরীর—আর ওই কুচ্ছিত মুখ, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা একটা চোখ, যেটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই আঙুরের গায়ে কাঁটা দিত, ঘিন ঘিন করত সারা গা, ভয় ভয় লাগত। বেশিক্ষণ তাকাতে পারত না লোকটার দিকে। নয়ত প্রভুলাল কতবারই তো ঘুর ঘুর করেছে—আঙুর এগুতে দেয় নি। মাগো, ওই লোকটার সঙ্গে কি শোয়া যায় নাকি? আঙুর তাহলে মরেই যাবে।

আজ আর অত কথা ভাল করে ভাবতে পারল না আঙুর। বরং ভাবছিল, প্রভুলালও যদি মাথা নাড়ে। না বলে।

ধুক ধুক বুকে প্রভুলালের দোকানের একেবাবে সামনে এসে দাঁড়াল আঙুর।

'সুর্মা আছে?' মুচকি হাসল আঙুব। একটু হেলে দাঁড়াল।

প্রভুলাল প্রথমটায় অবাক। তারপবে যেন শরীরের কোথাও একটা পালকের সুড়সুড়ি খেয়ে সারাটা গা-মুখ বেঁকিয়ে বুঁকিয়ে ফুলিয়ে হাসল। গলার মধ্যে সর্দি-জড়ানো আওয়াজের মতন ভাঙ্গা ভাঙ্গা আবেগ-স্বর উঠছিল।

সুর্মার দিকে হাত বাড়াল না প্রভুলাল। আঙুরের দিকে চেয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল, 'কি খবব? আঁ—তুমি কাঁহা ভাগ গিয়েছিলে! শালা সাবা পটি আন্‌ধার হয়ে গেল।'

হাসি আসছিল না। তবু আঙুব হাসল। যেন একটা ঝাপ্টা খেয়ে প্রভুলালেব কোলের ওপর পড়তে পড়তে উঠে সোজা হল। এলোমেলো আঁচলটা তো হাতে লুটোচ্ছিল, বুকের কাপড়টাও কখন সরিয়ে একপাশে গুটিয়ে দিয়েছে আঙুর। 'মস্‌করা থাক। সুর্মা আছে কিনা বলো। না থাকে তো যাই।' আঙুর মাঝ কোমর থেকে বুক পর্যন্ত এগিয়ে

দিয়ে আব্দার টেনে নিল। ঠিক যেমন লাট্টু ঘুরোতে লেত্তিকে ছেড়ে দিয়ে টানতে হয়। গলা বেঁকিয়ে চোখের পাশ দিয়ে বিভ্রম ছুঁড়ল।

'আছে, আলবৎ আছে।' প্রভুলালের চোখ চকচক করছে, 'তোমাদের আঁখে সুর্মা লাগাতেই তো বসে আছি।'

'থাক, তোমায় আর লাগিয়ে দিতে হবে না। হাতে পিঁপড়ে ধরে যাবে।' আঙুর আর এক দফা হেসে—প্রভুলালের বসবার জায়গাটার কাছে বেঁকে কনুই ভর দিয়ে দাঁড়াল। গালে হাত রাখল। ঘাড় হেলিয়ে মুখ-চোখ তুলে ধরল।

ঠেলে বেরিয়ে আসা মাছের পিত্তির মতন প্রভুলালের চোখটা যেন গলে গলে পড়ছিল। আঙুর চোখ বুজল।

'কিরপা থোড়ি কুছ হো যাক আঙ্গুরী! শালা কী চোট্ যে আছে তুমার বাস্তে।' প্রভুলাল কখন তার গরম হাতটা দিয়ে আঙুরের কনুইয়ের ওপরটা ধরে ফেলেছে।

আঙুর সেই অবস্থায় জোরে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে টেনে টেনে একবার নিশ্বাস নিল, আস্তে আস্তে ছাড়ল। বুক উঠল, নামল। ঠোঁট কামড়ে, বাঁ চোখ টিপে হাসল আঙুর।

'তোমার পচা আতরের গন্ধ ক'দিন থাকবে গো!' আঙুর ঠোঁট উল্টাল।

প'চা নেই, আসলি আতর দেব। যে ক'দিন রাখতে চাও।' প্রভুলাল আঙুরের গালে টোনা মারল।

আঙুর ভাবল। 'দশটা টাকা আজ দাও তবে?'

'দশ্—?' প্রভুলাল থতমত খেয়ে গেল, 'দ-শ কি রে?'

'দরকার আছে, দশ দাও। আগাম দাও—।'

'আগ্লি?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়ল আঙুর, 'দশ না পারো—সাত—আটটা টাকা দাও।'

মনে মনে হিসেব করে নিল প্রভুলাল। তারপর নিচু গলায় বললে, 'বহুত আচ্ছা, আট টাকা দোবো। মাগর—' প্রভুলাল কুচকুচে কালো মুখে, গোঁফের ডগায় হিসেবী একটা হাসি তুলল। আঙ্গুল দিয়ে দেখাল দিনের হিসেবটা। প্রায় সপ্তাহভোর আর কি!

ও-সবের দিকে চোখ ছিল না আঙুরের। হাত পাতল আঙুর। টাকা।

প্রভুলাল আঙুরের গালটা টিপে দিল। 'তু যা পাগলি, ঘর যা—সুরতটুরত থোড়া ঠিক করে লিগে যা; একদম্ কল্‌কত্তাবালী হয়ে যা দোকান বন্‌ধ্ করে আমি আসছি। টাকা লিয়ে যাব।'

আঙুর ভীষণভাবে চমকে উঠল। সমস্ত শরীরটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পা পাথর। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল আঙুর প্রভুলালের দিকে।

'কি রে?' প্রভুলাল আতরের শিশিটিশি, জর্দার নিক্তি ওজন গোছাতে লাগল।

আঙুর তার সাদা নিভন্ত চোখ তুলে আস্তে গলায় বলল, 'আমার ঘর না, তুমি অন্য কোথাও বল।'

এ-রকম কথা প্রভুলাল জীবনে আর শোনে নি যেন। 'বাঃ—! টাকা তুমি লেবে আঙ্‌গুরী—আর ঘর ঢুঁড়ব আমি। তব তো দুসরা আওরাত ভি—।'

আঙুরের চোখের ওপর প্রভুলালের মুখও আর ভাসছিল না। আলো, আয়না, হরেকরকম শিশি—আর ফাঁকা ফাঁকা ঝাপসা সব কী যেন। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে হলুদ বিকারের চোখে মানুষ যেমন কী দেখছে জানে না, বোঝে না, চেতনায় চিনতে পারে না, তেমনি।

একটু পরে আঙুর মাথা নাড়ল। বেশ, তবে তাই, আমার ঘরেই এসো তুমি। তাড়াতাড়ি।

প্রভুলালের দোকানের সামনে থেকে একটা অন্য রকম শরীর আর পা যেন জলো হাওয়া আর অন্ধকার আর পচ্‌পচে রাস্তা গলি দিয়ে নেশার ঘোরে টলতে টলতে মিশিয়ে গেল।

আঙুরের বুকের মধ্যে শব্দগুলো এলোমেলো। সমস্ত মাথাটা ঠাস; কিচ্ছু বুঝতে পারছে না, চোখে ঠাওর করতে পারছে না। হাত-পা সাড় পাচ্ছে না। একটা দম দেওয়া পুতুলের মতন যা হবার হয়ে যাচ্ছে, আপনা থেকেই।

কুপি জেবলেছে আঙুর। ধুনো পুড়িয়ে দিয়েছে ঘরে। ক'টা ধূপও। বাক্স থেকে শাড়ি বের করতে গিয়ে পাটের শাড়িটা খুঁজেছে প্রথমে—তারপরেই মনে হয়েছে আতাকে বিক্রি করে দিয়েছে সেটা খানিক আগেই। তাঁতের ঘোর লাল রঙের ছেঁড়া ছেঁড়া শাড়িটা তাড়াতাড়ি গায়ে পরে নিয়েছে, সেই সাটিনের পুরনো বডিজটা পর্যন্ত। চুল

বেঁধেছে। আলতা দিয়েছে পায়। টিপ আর কাজল।

প্রভুলাল এল। ঘরটা বড় অন্ধকার। 'লণ্ঠন কি হল? টুট্ গিয়া—?' আতরের গন্ধ প্রভুলালের জামায়। হাতে পানের ঠোঙা। মুখে একগাল পান, জর্দা।

প্রভুলালের চোখ লালচে, চকচকে। মাছের পিত্তির মতন চোখটা যেন গলেই গেল। ওর নাকের নিশ্বাসে হিস্হিস শব্দ। লাল দাঁত-গুলো তৈরি, খাবারটা পেলেই যেন চিবিয়ে চুষে সাবাড় করে দেয়।

আঙুরের শরীরটা যেন নদীর জলে ভাসছে—সাড় হারিয়ে। কি হচ্ছে ও জানে না, বুঝতেই পারছে না। মনটা শুধু সময় গুনছে—রাত কত হল! বিশু কি থাকবে হাঁদুর দোকানে? যদি বৃষ্টি আসে ঝমঝমিয়ে আবার! তবে কি হবে? সারারাত কি ফেলে রাখতে হবে! দোষ ধরল না তো! শনির দুপুরের মড়া।

নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না আঙুর। কুপির আড়াল পড়েছে। একটা ভাগাড়ের খ্যাপা কুকুর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে।

মনের জ্বালাটা আরও বাড়ছে। বাড়ুক। কিসের ওপর, কার ওপর সে প্রতিশোধ নিচ্ছে, তা জানে না। তবে অনুভব করতে পারছে, এই কষ্ট—এই যন্ত্রণা অনেকটা তেমনি।

আবার কি বৃষ্টি এল? না, বৃষ্টি নয়। বৃষ্টি যেন আর না আসে, হে মা কালী! কোনোগতিকে শ্মশান পর্যন্ত যেতে দাও। চরণে পড়ি তোমার।

প্রভুলাল খুশী। আঙুর হাত পাতলো। চোব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে যেমন হোটেলের দাম মেটায় মানুষ—তেমনি, ঠিক তেমনি আরও দু'খিলি পান জর্দা মুখে দিয়ে, রুপোর দাঁত-খোঁটা কাঠিটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আটটা টাকা দিল প্রভুলাল হেসে হেসে। আঙুরের গালটা আর একবার টিপে দিয়ে চলে গেল।

টাকা আটটা আঁচলে বেঁধে নিল আঙুর। আগের টাকাগুলোও। তারপর বাইরে এসে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। আঁট করে।

আতা চামেলিদের ঘরে তখন আলো, হাসি, হুড়োহুড়ি, ঝুম্ ঝুম্, তালি, বেসুরো গান আর দিশী মদের গন্ধ।

আঙুর তর তর করে দাবায় নেমে গেল। তারপর বাইরে। সদর রাস্তায়। হাঁদুর দোকানে বিশু কি আছে এখনও!

বিশুদের নিয়ে ফিরল আঙুর। দরজা খুলে ঢুকল।

পিছু পিছু বিশু।

'কই মড়া কই! আ, খুব বাহারে ধূপ জ্বালিয়েছিস তো, পটলি।' বিশু নাক টেনে গন্ধ নিল ধূপের।

আঙুর লণ্ঠন জ্বালাল।

বিশু তাকাল এদিক, ওদিক। 'মড়া কই?'

আঙুর আঙুল দিয়ে চৌকির তলাটা দেখিয়ে দিল।

বিশু মুখ নীচু করে দেখল। অবাক ও, চোখের পাতা পড়ল না। 'ওর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল কি করে?'

আঙুর সে-কথার কোনো জবাব দিল না।

বিশু একটু অপেক্ষা করে সঙ্গীদের ডাকল। ডাকবার আগেই পেঁচো, বীরে, ঢুকে পড়েছে।

বিশু বললে, 'বাঁশ এনেছিস তো, লে শালাকে টেনে বের করে বাঁধ।'

মড়া নিয়ে বিশুদের বেরুতে খুব একটা সময় লাগল না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আঙুর দাওয়ায় নামল।

আঙুর বলল, 'হরিবোল দিবি না?'

বিশু জবাব দিল, 'চল্, রাস্তায় গিয়ে দেব। এখানে রসের হাটে হরিবোল দিলে শালাদের মেজাজ গণ্ডগোল হয়ে যাবে।'

বিশু, কেলো সামনে—পেঁচো আর বীরে পেছনে। মাদুরে জড়ানো দড়ি দিয়ে বাঁধা নন্দর ধড়—বাঁশের ওপর চাপিয়ে চারটে লোক দাওয়া দিয়ে এগিয়ে গেল। চারটে ছায়া। আর আঙুর পিছন পিছন।

আতার ঘরে তখন বস্ত্রহরণ পালার হাসি-উল্লাসের ঝাপ্টা বয়ে যাচ্ছে।

শ্মশানে এসে পেঁছিতে প্রায় মাঝ রাত হয়ে গেল। কেলো গেল কাঠ আনতে, পেঁচো পাঁইট আনতে। কাছাকাছি সে-ব্যবস্থা আছে। বিশু বিড়ি ফুঁকতে লাগল। আর বীরে একটা সিনেমার গান গাইতে লাগল, সদ্য কেনা হাঁড়িটার পেছনে বোল তুলে।

আঙুর চুপ করে বসে থাকল এক পাশে।

বিশুর দলের বাহাদুরী বলতে হবে— ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলল। গঙ্গার জলে ধোয়ান হল নন্দর দেহ। চিতে সাজিয়ে শোয়ান হল। এবার মুখে আগুন দেওয়া।

পাঁকাটিতে আগুন ধরিয়ে বিশু আঙুরের দিকে এগিয়ে দিল। বললে, 'নে পটলি, মুখে আগুনটা দিয়ে দে।'

আঙুর চমকে উঠল। নন্দর মুখে আগুন দেবে ও? কেন? নন্দর সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? কিচ্ছু না। কেউ না নন্দ ওর।

আঙুর মাথা নাড়ল। 'আমি কেন দেব। না—না, তোমরা কেউ দিয়ে দাও।'

'দিবি না তুই? লে কেলো, তুই-ই তবে দিয়ে দে শালার মুখে আগুন।'

কিন্তু কেলো ততক্ষণে একটু পাশে গিয়ে পাঁইটে মুখ দিয়েছে। পেঁচো বলল আঙুরকে, 'আহা দাও না তুমি। তোমার সঙ্গে তবু তো জানাশোনা ভাবসাব ছিল খানিকটা, আমরা তো সব রাস্তার লোক।'

জানাশোনা, খানিকটা ভাবসাব? তা হ্যাঁ, তা ছিল বৈ কি। আঙুর সেটা অস্বীকার করতে পারে না। এতো লোকের মধ্যে একমাত্র আঙুরই তবু নন্দকে চিনত, জানত। ওর সঙ্গে এক ঘরে থেকেছে, খেয়েছে, শুয়েছে। শখের স্বামী-স্ত্রী খেলা—তাও খেলেছে। শাঁখা-সিঁদুরও পরেছে।

পাঁকাটিটা জ্বলছিল। সে-দিকে তাকিয়ে আঙুর কেমন যে দিশে-হারা হয়ে গেল। তারপর হাত বাড়াল বিশুর দিকে।

জ্বলন্ত পাঁকাটি নিয়ে নন্দর মুখের কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল আঙুর। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে পাঁকাটিগুলো। সেই আলোয় নন্দর শুকনো, তোবড়ানো, বাসি ডিমের মত সেদ্ধ মুখটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যেন সব যন্ত্রণার শেষ ঘা খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'সামলে রে পটলি শাড়িতে আগুন ধরে যাবে।' বিশু হাঁকল।

আঁচলটা সামলাতে গেল আঙুর। এক্ষুনি পাঁকাটির আগুন লেগে যেত।

কিন্তু শাড়ির আঁচল সামলাতে গিয়ে—পাঁকাটির আগুনে যেন হঠাৎ কী দেখল আঙুর। দেখে নিথর হয়ে গেল। মনের মধ্যে কী যে অস্বস্তি জাগল! গা ঘিন ঘিন করে উঠল।

নিজেকে বড় অশুচি অশুচি লাগছিল। এই শাড়ি পরে একটু আগে প্রভুলালের সঙ্গে সে শুয়েছে। এখনো সেই ভাগাড়ে, কুকুরটার—? —না, এই বস্ত্রে কারুর মুখে আগুন দেওয়া যায় না। নন্দ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে—কে জানে, তবে এই সংসার তো ছেড়ে চললই। এ-সময়ে আর খুঁত থাকে কেন!

পাঁকাটি ক'টা মাটিতে নামিয়ে রেখে আঙুর হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছিস আবার?' বিশু অবাক।

'আসছি। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।' আঙুর তরতরিয়ে ডাইনে ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ধাপ ভেঙে গঙ্গার জলে এসে দাঁড়াল আঙুর। আকাশটা লাল। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে হু হু। গঙ্গার জল কালো। একটা শব্দ উঠছে স্রোতের। ঘাটে আছড়ে পড়ার।

জলে পা দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে এই আকাশ এই জল এই নিস্তব্ধতা যেন মনে, বুকে, গায়ে মেখে নিচ্ছিল আঙুর। মাথাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল ঘোলাটে মনটাকে ধুয়ে নিচ্ছিল। কেমন একটা পচা গন্ধ এসে নাকে লাগল আচমকা। নিশ্চয় কোনো গলা-পচা গরু ছাগল কি মোষটোষ হবে, জলে ভেসে এসেছে। আধপোড়ান মানুষ-টানুষও হতে পারে।

বড় বিশ্রী গন্ধ। এদিক ওদিক চাইল আঙুর। নাক বন্ধ করল। একটু পরে আবার খুলল। আর ধক্ করে যে-বিশ্রী গন্ধটা নাকে এসে লাগল সেই গন্ধটা বড় চেনা চেনা ঠেকল। হ্যাঁ, বিশুর গায়ে এই গন্ধ ছিল, এই গন্ধ আছে আতা, বেদানামাসি, প্রভুলালের গায়। সর্বত্র।

আঙুরের চোখের সামনে সত্যিকারের গঙ্গা যেন এইবার আলো হয়ে উঠল। কোথায় সে পাপ ধুতে এসেছে, অশুচি ছাড়াতে—?

মাথার মধ্যে একটা শিরায় যেন ফস্ করে কেউ দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিল। জ্বলে উঠল সমস্ত শিরা স্নায়ুগুলো। অশুচি, কিসের অশুচি? গঙ্গাজল তার কোন্‌টা ধোবে—বস্ত্র না দেহ না মন! বেদানা-মাসি হিমুর গা অনেক ধুয়েছে গঙ্গা। কি দিয়েছে?

গঙ্গার জলে একটা লাথি মারল আচমকা আঙুর। আর তারপর ছুট। ছুটতে ছুটতে এসে জ্বলন্ত পাঁকাটি ক'টা নিয়ে নন্দর মুখে ঠেসে দিল।

আগুন ধরল। আঙুর চুপ করে দাঁড়িয়ে। এখানে আগুন, ওখানে

আগুন। আ, সাজিয়েছে বটে বিশুরা চিতা! শুকনো কাঠ বেছে বেছে এনেছিল। চোখের পলকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা।

খানিকটা পিছিয়ে এসে আঙুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশুরা একটা পাঁইট শেষ করে আর একটা খুলল।

আকাশটা লাল। খুব লাল। বৃষ্টি না এসে পড়ে।

নন্দর মুখটা আর দেখা যাচ্ছে না। বীরে খুঁচিয়ে দিচ্ছে এ-পাশ ও-পাশ। লাঠি মারছে।

আঙুর অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে এই অদ্ভুত দাহ দেখছে।

আগুনের হল্‌কাটা হঠাৎ ধক্‌ করে বেড়ে উঠল। সমস্ত চিতাখানা টকটকে লাল। সে-দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আঙুর আচমকা খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামে না। যেন মাতাল হয়ে গেছে।

বীরে খোঁচাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে পা ভেঙে দিচ্ছে শবের। পেটাচ্ছে। কাঠ পুড়ে পুড়ে ভাঙছে—মট্‌ মট্‌। হাড় ফাটছে নন্দর। ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না!

আর আঙুরের কানে সেই শব্দগুলো লাগছে ভয়ানক ভাবে। ছটফট করছে আঙুর। যেন তার বুকের হাড়গুলো কেউ মট মট্‌ করে ভেঙে দিচ্ছে। বুকের মধ্যে থেকে এক খাবলা কিছু নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওই আগুনে।

আঙুর আর পারছিল না। অস্থির হয়ে উঠছিল। কী যে অসহ্য একটা জ্বালা দাপাদাপি করছে তার মধ্যে। মোচড় দিয়ে উঠছে সারাটা বুক। কণ্ঠার কাছে টনটনে ব্যথাটা ফুলছে আর ফুলছে।

আঙুর পারছিল না। ওই চিতা দেখছিল নন্দর। আর মনে মনে ভাবছিল সব—সব তোমরা সমান। সবাই। তুমি, হিমু, বেদানামাসি, হাসপাতাল, ডাক্তার, আতা, বিশু, মানিকবাবু, প্রভুলাল—সবাই। তেমনি তোমাদের গঙ্গা। সবই তো এ-সংসারেরই কাদা, মাটি, জল। এক ছাঁচ, একই নক্‌শা।

আঙুরের কষ্ট হচ্ছিল, অযথাই সে একা নন্দর ওপরই রাগ আর ঘেন্না আর জ্বালা নিয়ে থাকল।

আঙুর কাঁদল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ফুঁপিয়ে। ঠোঁট কামড়ে ধরে। নন্দর চিতার আগুন যেন তার সমস্ত চোখ মন শরীর জুড়ে জ্বলছে। বড় দুঃসহ সে-আগুন। বড় স্পষ্ট। সবকিছু তার আলোয় ঝকঝকে

হয়ে উঠেছে। এই সংসার, এখানের ভালবাসা, ঘর গড়া, ঘর ভাঙা, মানুষ, মানুষের ব্যবহার, মন।

আঙুর ডুকরে উঠল। সকলকে চমকে দিয়ে। এই প্রথম। হঠাৎ, হঠাৎই। বর্শায় খোঁচা খাওয়া একটা পশুর মত সমস্ত জায়গা কাঁপিয়ে, থর থরিয়ে। তারপর গুমরে গুমরে। কাতরে কাতরে।

আঙুরের ইচ্ছে হচ্ছিল, ওই চিতার কাছে ছুটে গিয়ে নন্দর আধ-পোড়া ঝলসানো পা দুটো বুকে চেপে ধরে। মাথা খোঁড়ে।

আঙুর সত্যিই ছুটে যাচ্ছিল। বিশু খপ্ করে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'কি রে পট্লি মরবি নাকি?'

না, আঙুর মরবে না। চোখ তুলে বিশুর দিকে চাইল ও। তারপর আকাশের দিকে। এ-পাশ, ও-পাশ। চিতা এবং গঙ্গার দিকেও। যেন এই সংসারের আকাশ, মাটি, মানুষ, জন—সব তার চেনা হয়ে গেল। আর সে মরবে না, কাঁদবে না!

আঙুরলতা | অর্ধবৃত্ত

অর্ধবৃত্ত

ইলেকট্রিক-বিলটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে মোহিত ডাকল নীরজাকে। পাশের ঘরে বসে নীরজা স্বামীর জন্যে জুঁই হরিতকী গুঁড়ো করছিলেন হামানদিস্তেতে। দুপুরে একটু গা গড়িয়ে সবে উঠেছেন। মুখের পানটা পর্যন্ত ফুরোয় নি। সাড়া দিলেন না নীরজা। কিন্তু উঠলেন। সদগুরু-সঙ্গর পাতা থেকে মুখ তুলে অক্ষয়বাবু নিচু-গলায় বললেন, 'সেই চিঠিখানা নিয়ে যাও না। ওকে দেখিও। আমার তো খুবই ইচ্ছে। যদি ও মত করে—।'

অক্ষয়বাবু সদগুরু-সঙ্গের ফাঁক থেকে চিঠিটা বার করে দিলেন।

মোহিত গায়ের জামাটা ছেড়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। যেন নীরজারই অপেক্ষা করছিল দরজার দিকে চেয়ে।

নীরজা ঘরে ঢুকতেই মোহিত বলল, 'এ-মাসের ইলেকট্রিক-বিলটা দেখেছ ?'

মাথা নাড়লেন নীরজা। না, দেখেন নি। 'পিওন কখন এসেছিল, আমি দেখি নি। বউমাই চিঠি নিয়ে রেখেছে। তোর বাবারও চিঠি এসেছে একটা।' নীরজা মুঠোয় ধরা পোস্ট কার্ডটা দেখালেন।

বাবার চিঠি সম্পর্কে মোহিতের কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। ইলেকট্রিক বিলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে মোহিত বললে, 'ওই বিলটা নিয়ে যাও। তুমি দেখ, বাবাকে দেখাও—আর মন্টুবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে দেখিও।'

নীরজা বিলটা সত্যিই আর নিলেন না। ছেলের বিরক্ত, অপ্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমরা আর দেখে কি করব! মন্টুরা বাড়ি নেই। বউমার বাপের বাড়িতে কে যেন এসেছে দিল্লী থেকে—দেখা করতে গেছে। কি হয়েছে কি? বেশি টাকা উঠেছে এবার—?'

বিলের কাগজটা ঘিঞ্জি টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে মোহিত। 'এ টাকা আমি দেব না, কিছুতেই না। ভেবেছে কি সব! সারা রাত ধরে বাতি জ্বালিয়ে ফ্যান্ ঘুরিয়ে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে

গল্পগুজব করবেন আর আমায় তার টাকা দিতে হবে!'

নীরজা একটু চুপ। তারপর যেন কথা বলবার সুযোগ পেয়ে বললেন, 'তা আমি কি করব! আমার বলা বৃথা। দশটার পর কখনো যদি আমার ঘরে বাতি জ্বলে। তোমার বাবা আলোয় ঘুমোতে পারেন না। বাতি নিভিয়ে দি। আর রেবার তো বাতি জ্বালিয়ে পড়ার বালাই নেই। ন'টা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমাদের ঘরে পাখাও নেই যে সারারাত ঘুরছে।'

'পাখা আমার ঘরেও নেই।' মোহিত বললে।

'তবে যার ঘরে আছে, যার ঘরের পাখা ঘোরে—তাকে তুমিই বল। আমি পারব না। এমনিতেই তো আমি দোষের ভাগী হয়ে রয়েছি।' নীরজা বিরস মুখে চুপ করে গেলেন।

যে-কথাটা আজ ক'দিন ধরেই ভাবছে মোহিত—সেই কথাটা এবার তুলল। 'আমি ঠিক করেছি একটা মেসে চলে যাব। এ-বাড়িতে আর পোষাচ্ছে না।'

নীরজা অবাক। কথাটা শুনতেও যেন কেমন লাগল তাঁর। ছেলের মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকলেন।

মোহিত এতক্ষণে গেঞ্জিটা খুলে ফেলল। জালনায় বসানো কুঁজো থেকে নিজেই জল গড়িয়ে খেল। ঘরে জায়গা নেই যে পায়চারি করবে। মার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও তার অস্বস্তি লাগছিল। কিছু করবার না পেয়ে এবং হঠাৎ আলনায় টাঙানো জামাটার দিকে চোখ পড়তে মোহিত আচমকা বললে, 'আমায় একটু ছুঁচসুতো এনে দাও— যদি থাকে তোমাদের বাড়িতে।' কথাটা বলে মোহিত অপেক্ষা করতে থাকল। এরপর, এই কথা থেকে কথা উঠে কোথায় গড়িয়ে যাবে মোহিত তা জানত। আর সেটাই যেন ও চাইছিল।

জামাটা আলনা থেকে নামিয়ে নিয়ে তক্তপোশের ওপর বসল মোহিত।

ব্যাপারটা নীরজার ভাল লাগল না। বললেন, 'কি হয়েছে জামায়?'

'একটাও বোতাম নেই। বুক পকেটটা ছিঁড়েছে।'

'তা কথাটা বললেই হত। বাড়িতে তো বোতাম বসাবার লোকের অভাব নেই।' নীরজা অসন্তুষ্ট। 'দাও, আমি বসিয়ে দেব।'

মোহিত জামা দিল না; জবাব দিল। 'বাড়িতে যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার সঙ্গে দরকার শুধু টাকার।' একটু থামল

মোহিত, দেওয়ালের দিকে তাকাল; 'আমি দেখেছি, খুব ভাল করেই লক্ষ্য করেছি। টাকাটাই যখন আসল তখন টাকাটা তোমরা পাবে। মাঝে মাঝে আমার যা সামর্থ আমি দেব।' মেসের কথাটা আর তুলল না মোহিত। যেন মুখে আবার করে বলবার দরকার করে না।

নীরজা ছেলের কোলের ওপর থেকে জামাটা তুলে নিলেন। বললেন, 'এ-সব তোমার অযথা রাগ। মন্টুর বউয়ের কথা আলাদা। কিন্তু আমি, রেবা—আমাদের তো মুখ ফুটে বললেই হয়। সংসারের সাত দিকে চোখ রাখতে গেলে টুকটাক অমন ভুল হয়েই থাকে।'

জামাটা নিয়ে নীরজা চলে যাচ্ছিলেন। দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়ালেন। ভাবলেন, কথাটা বলবেন কী বলবেন না। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'সারা রাত ধরে বাতি জ্বালানো আর পাখা ঘোরানোর কথা বউমাকে আমি বলতে পারব না। তুমিই বলো মন্টুকে।'

মাথা নাড়ল মোহিত। না, না, সে ও-সব পারবে না। যদি ওদের কাণ্ডজ্ঞান, চক্ষুলজ্জা, বুদ্ধিসুদ্ধি না থাকে—না থাকুক। তা বলে, মোহিত সাতটা টাকা বিল বেড়েছে বলে এই কথাটা তার ছোট ভাইকে বলতে পারবে না যে, ওহে তোমাদের দাম্পত্য হাসি ঠাট্টা, গালগল্পের জন্যে সংসারের ছ'সাতটা টাকা অপব্যয় হচ্ছে। কি ভাববে মন্টু, বা মন্টুর স্ত্রী ঝরনা।

নীরজা কিন্তু বিরক্ত হলেন। বললেন, 'বেশ আমিই বলব। বললে তো তুমি রাগ করবে, কিন্তু এ-সবের জন্যে তো তুমিই দায়ী। মন্টুর বিয়ে দিতেও আমরা চাই নি, নতুন বউয়ের কষ্ট হচ্ছে গরমে বলে তার ঘরে ভাড়া করা পাখাও ঝুলিয়ে দিই নি।' নীরজা শুধু বিরক্তই নয়, বেশ একটু ঈর্ষাকাতর কণ্ঠেই যেন কথাটা বললেন।

মোহিত চুপ। নীরজা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

অভিযোগটা এই প্রথম নয়। দু'মাসের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ বার শুনল মোহিত। আর ভাল লাগে না এখন শুনতে। মোহিত বুঝতে পারে না, অন্যায়টা তার কিসে হয়েছে। বরং বাবা কি মার মতন মন্টুকে সরাসরি যদি সে বলত, আমরা জানি না, তোমার খুশি; বিয়ে করবে করো, আমাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই; এ-বাড়িতে জায়গা হবে না থাকার—অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকগে যাও, তুমিই তোমার

বউকে খাইও পরিও—তবে কি সেটা ভাল হত!

মোহিতের মনে হয় না, সেটা ভাল হত। যে-রকম স্থির এবং দৃঢ় দেখা গিয়েছিল মণ্টুকে তাতে বিয়েটা সে করতই। ফলাফল কি হবে, হতে পারে সে-বিচার করত না। মণ্টু ওই ধরনের ছেলে, ভবিষ্যতের দিকে তার চোখ নেই। একটু স্থির হয়ে ভাববে কি তলিয়ে দেখবে, বুঝবে—সে মনই নেই। যা হচ্ছে হোক, যা করছি করি—পরের কথা পরে। মোহিতের তো অবাক লেগেছিল মণ্টু যখন অসঙ্কোচে, সপ্রতিভ ভাবে তার কাছে আগাগোড়া সব বলে গেল।

বাস্তবিকই মোহিত তখন ভাইকে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল এবং ভেবেছিল; দিশি একটা বইয়ের দোকানে ক্যাটলগ্ তৈরি করে, মাইনে সত্তর টাকা, এই ছেলে যে কোনো মেয়েকে ভালবাসার কথা ভাবতে পারে, ভালবাসে এবং সেই ভালবাসার পালাটা দু'টো চিঠি বা ক'ফোঁটা চোখের জলে ফুরোতে না দিয়ে সরাসরি বিয়ে পর্যন্ত এগিয়ে আনতে থামে না—মোহিতের তা ধারণার বাইরে ছিল। কিন্তু মণ্টুর মুখ-চোখ কথাবার্তা কোনো কিছুতেই অবিশ্বাস করার মতন কিছু পায় নি মোহিত। হঠকারিতা করার বয়স বলে বাস্তবিক কিছু আছে তা সে মনে করে নি। সব বয়সেই সেটা সম্ভব। মণ্টু হঠকারিতা করছে, মোহিত হয়ত তা ভেবেছিল। ছোকরা বোকামি করছে—এও হয়ত না মনে করে পারে নি। কিন্তু মণ্টুর সাহস আর সততাকে মোহিত সন্দেহ করে নি। খুবই বিস্ময়বোধ করেছিল। আর যদিও মনে মনে বলেছিল, কী দুঃসাহস, কী দুঃসাহস—তবু কেমন একটা আচমকা আবেগের বশে মণ্টুর পিঠ থাবড়ে দিয়েছিল। তা বলে সত্যিই আর পিঠে থাবড়ায়নি, যে-রকম লঘু সুরে এবং জোরে, একটু হেসে মাথা হেলিয়ে সমর্থন করেছিল তাকে পিঠ থাবড়ানোই বলে। ব্যাপারটা তখন যা ঘটল তাতে মনে হল, মণ্টু যে এ-রকম একটা ভদ্র, রুচিসম্মত, ও পুরুষমানুষের মতন কাজ করছে এতে আপত্তি করা দূরে থাক মোহিতের সমর্থন পুরোপুরি। সত্যি, সমর্থন করে—মণ্টুকে সমর্থন করে মনে মনে একটা সুন্দর সুখ পেয়েছিল মোহিত। আর মা, নীরজাকে বলেছিল, বড় বাড়ি, ঝকঝকে তকতকে ফার্নিচারের মধ্যে বড় মন থাকে না মা, ছোটখাট কাজের মধ্যে, আমাদের সম্মতি আপত্তি সমর্থন এ-সবের মধ্যে তার বহু পরিচয় থাকে। তুমি না বলো না। মণ্টু বিয়ে করুক,

রেজেস্ট্রি ম্যারেজই করুক, একটা পেট বাড়লে সংসারে দুর্ভিক্ষ লাগবে না।

কিছু না, কিছু না করেও মণ্টুর বিয়েতে শ'চারেক টাকা খরচা করে ফেলল মোহিত। টাকাটা রেবার বিয়ের অংকে গচ্ছিত রেখেছিল ও। দু-দশ জন বন্ধুবান্ধবকে খেতে বলা হল। একটা সোনার জিনিসও নতুন বউকে দিল মোহিত—সংসারের তরফ থেকে। ঝরনা যে এ-বাড়িতে অযাচিত এবং অসম্মানিত এটা যেন সে না বোঝে।

ঝরনাকে পরে দেখে শুনে মোহিতের ভালই লেগেছে। বেশ হাসি-খুশি, কাজের মেয়ে। দুঃখ বা অভাব ওকে আঁচড়াচ্ছে না। সেজন্যে ও ছটফট করে না, মুখভার করে না, কাঁদে না। শাড়ি গয়নার জন্যে ওর মণ্টুর সঙ্গে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি নেই। সকালে উঠছে, কয়লা ভাঙছে, উনুন ধরাচ্ছে, চা তৈরি করছে—মা-র সঙ্গে কাজ করছে, রেবার সঙ্গে হাসি-তামাসা—বাবার পা টিপে দিচ্ছে কি পানটা সেজে দিচ্ছে। কোথাও যে ওর অভাব আছে—অপূর্ণতা আছে তা মনে হয় না।

তবু মোহিত তার ঘরটা ছেড়ে দিল মণ্টুদের। এই চিলতে ঘরটাই নিজে নিল। ওরা দু'জন, স্বামীস্ত্রী—ওদেরই বরং একটু জায়গাওলা খোলামেলা ঘর দরকার। মোহিত একা। এই ঘরেই তার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

ঘরটা পেয়ে ঝরনা যে খুব খুশি হয়েছে এটা মোহিত বুঝতে পেরে-ছিল। কেন না, তিনদিনেই ঘরটার চেহারা পালটে দিল মেয়েটা। রঙ-সাবান দিয়ে পুরনো কাপড় রঙ করে পরদা করল ঘরের, বাক্স তোরঙ্গ-গুলো সাজাল, তক্তপোশটার ওপর বিছানাটা তকতকে করলে, দেওয়ালে দুটো ছবি টাঙালে—এমনি কত কি! একদিন আচমকা সে-ঘরে পা দিয়ে মোহিত তা দেখেছিল। এবং খুশি হয়েছিল।

মা অবশ্য প্রায়ই খুঁত ধরত ঝরনার। তাই নিয়ে চেঁচামেচিও করত। ঝরনা যদিও নীরজার কথা নিয়ে ঝগড়া করত না—কিন্তু জবাব দিত। জবাবটা হত ঝরনার মনোমতন, নীরজার নয়।

নীরজাকে মোহিত কয়েকবারই আড়ালে এ-ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছে। বরং বলা ভাল মাকে বুঝিয়েছে। 'দেখ মা, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি নিজে পছন্দ করে ছেলের বিয়ে দাও নি বলে ঝরনা তো আর পরের বাড়ির বউ নয়, তোমার বাড়ির বউ। ওভাবে খিটখিট করো

না। তাতে ও মনে কষ্ট পাবে, মণ্টুও দুঃখ পাবে। তা ছাড়া, তুমিই বা ওর খুঁত ধরার জন্যে সব সময় ওৎ পেতে থাকবে কেন? আমরা যে ভদ্র, ভাল পরিবার এটা আমাদের গায়ে লেখা নেই। মনে এবং ব্যবহারে সেটা প্রকাশ পায়। না, না—তুমি অশান্তি করো না। মণ্টুর বউ ছেলেমানুষ, সে কি বলে না বলে ও-সব কানে তুলো না।'

যেখানে মোহিতের সমর্থন সেখানে আর কথা বলবে কে? অন্তত সরাসরি। কাজেই ইদানীং বাড়ির আবহাওয়াটা শান্ত এবং সুন্দর ছিল বলা যায়।

আবহাওয়াটা খারাপ হল হঠাৎই। কেন হল, কি যে কারণ কেউ জানল না। এমন কি মোহিতও না।

মোহিত বরাবরই লক্ষ্য করেছিল, ঝরনা—মণ্টুর বউ ঝরনা—যাকে বলতে গেলে মোহিতই এ-বাড়িতে সাদরে এবং সসম্মানে এনে স্থান দিয়েছে—সেই ঝরনা মোহিতকে দেখলে বা মোহিতের সাড়া পেলে এমন জবুথবু আড়ষ্ট হয়ে যায়, যা দেখলে অনায়াসেই মনে হতে পারে—মোহিত একটা ভীতিকর জন্তুবিশেষ। না, এ-বাড়িতে ও-সব খুঁত-খুঁতের চল নেই যে, ভাশুরকে দেখা যাবে না, তার চোখের সামনে দাঁড়ানো যাবে না, ছায়া মাড়ানো চলবে না। ঝরনাও এক গলা ঘোমটা দিয়ে মোহিতের চোখের সামনে যে আসে তাও না। এমনি মাথায় সাধারণ কাপড়টুকু দেয়, যেমন সবসময়ই দিয়ে থাকে। মোহিতকে বলে 'দাদা'। চা জলখাবার এনে দেয়। প্রয়োজনে কথাও বলে দু-চারটে আস্তে গলায়। কিন্তু বেশ বোঝা যায়—মোহিতকে বড় বেশি সমীহ করে ঝরনা, বড় বেশি রকম মান্য।

মোহিত এটা পছন্দ করছিল না। রেবাকে সে-দিন বেড়াতে নিয়ে গিয়ে মোহিত বোনকে রাস্তায় বার বার বলছিল, 'বুঝলি রেবা, তোর ছোটবৌদি খুব ঠকে গেল। যদি আসত বেড়ান তো হতোই, তোর মতন একটি কটকী থলিও জুটে যেত। এক নম্বরের বোকা ও।'

'ছোড়দা যে আজ ওকে সিনেমায় নিয়ে যাবে বলেছে।' রেবা জবাব দিল।

'কে, মণ্টু! ধ্যুত, মণ্টু নিয়ে যাবে, সিনেমায়! ওই আশাতেই নাচুক গে যাক্, তোর ছোটবৌদি।'

'না, না—ছোড়দা সত্যিই নিয়ে যাবে। আমি টিকিট দেখেছি।' রেবা

জোর দিয়ে বল্ল।

'কতোর টিকিট ?'

'পনেরো আনার।'

মোহিত হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, 'তোর ছোটবৌদি সত্যিই বোকা। আমার সঙ্গে এলে আমি এক টাকা পনেরো আনার সিটে সিনেমা দেখাতাম।'

রেবার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আমায় একদিন খু-ব দূর থেকে, ভেলভেট্ মোড়া সিটে বসিয়ে—একটা সিনেমা দেখাবে বড়দা? কক্খনো দেখি নি।'

'দেখাব।' মোহিত মাথা নাড়ল। তারপর রেবার হাত ধরে টানল একপাশে, 'চল্ ওই দোকানটায় যাই। তোকে একটা শাড়ি কিনে দেব।'

সত্যিই রেবাকে আচমকা একটা শাড়ি কিনে দিল মোহিত। এবং দামটা কয়েকবারই বোনের কাছে নানাভাবে বলল।

পরের দিন সকালেই রেবাকে একসময়ে ডেকে মোহিত শুধাল, কি রে, তোর ছোটবৌদি কি বললে ?'

'কিসের ?'

'শাড়িটার কথা। কেমন শাড়ি ?'

'ভাল বললে।' রেবা জবাবটা দিল, কিন্তু বুঝতে পারল এ-জবাবে বড়দা খুশি হল না।

মোহিত নিজেও ভাল করে বোঝেনি—সে-দিন থেকে ঝরনা এবং মণ্টুর ওপরে ও কেন একটু অসন্তুষ্ট, অখুশি হয়েছে।

দিন দুয়েক পরের ঘটনায় বাস্তবিকই বিরক্ত এবং বীতস্পৃহ হল মোহিত।

তখন রাত। বাড়ির সবাই ঘুমোতে গেছে। নিজের এক চিলতে ঘরটায় শুয়ে মোহিত গরমে ঘামছিল। ঘুম আসছিল না। হাত পাখার হাওয়ায় গা জুড়োচ্ছিল না। অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়েও যখন ঘুম এল না, গরমের অসহ্য ক্লান্তিটা গেল না—বাইরে বেরিয়ে এল মোহিত। দরজার কাছে বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে থাকল।

মণ্টুদের ঘরে অবশ্য তখন আর বাতি জ্বলছিল না। কিন্তু ভাড়া করা পাখাটার একটা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ উঠছিল—এবং এই বারান্দা পর্যন্ত ভেসে আসছিল। মোহিত শব্দটা মাঝে মাঝে শুনছিল, আর ভাবছিল

আজ বোধ হয় দুটোতে ঝগড়াঝাঁটি, মান অভিমান করেছে—আর তাই এত তাড়াতাড়ি বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। নয়ত রাত দুটো তিনটের আগে ওদের ঘরের নীল বাতি নেভার কথা নয়।

মণ্টুটা বড় গোঁয়ার-গোবিন্দ। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করবার এখনই তোর কি হল রে! এখনো পুরো দু-মাস হয় নি বিয়ে করেছিস—এরই মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি! রাস্কেল কোথাকার! আসলে লেখাপড়া খানিকটা না শিখলে মনের সৌন্দর্য তৈরি হয় না। আই, এ পর্যন্ত পড়ে বাবু ভাবলেন, যথেষ্ট হয়েছে। মোহিত বার বার বলেছে, বি, এ টা অন্তত পড়। তা উনি পড়লেন না। কি না, পড়ায় আমার মাথা নেই। ইডিয়ট, পড়ার মগজ নেই, প্রেম করবার মগজ তো বেশ আছে। না, ঝরনার পরিণাম খারাপ। ছোঁড়াটা তার ভালমানুষ বউটাকে জ্বালিয়ে মারবে।

মোহিত ভাবছিল বেশ তন্ময় হয়ে, হঠাৎ উঠোনে একটা শব্দ হল। বেশ ভারি শব্দ।

তাড়াতাড়ি বারান্দার সুইচটা জেবলে দিল মোহিত। কলতলার কাছে উঠোনে ঝরনা একেবারে টান টান হয়ে পড়েছে। পড়ার ভঙ্গিটা এমন, আর চট্ করে উঠছে না দেখে মোহিতের মনে হল, এই রে হাত পা কি কোমর কিছু একটা ভেঙেছে মেয়েটা।

ব্যস্ত হয়ে উঠোনে একেবারে ঝরনার পাশটিতে এসে দাঁড়াল মোহিত। তারপরই হাঁটু গেড়ে মোহিত ঝরনাকে তুলে ধরতে গেল। ঝরনা ততক্ষণে পা টেনে, গায়ের শাড়িটা ঠিক করে, মাথায় ঘোমটা উঠিয়ে সংকুচিত হয়ে বসেছে।

'কোথায় লাগল! পায়ে—হাতে!' মোহিতের গলায় উদ্বেগ।

ঝরনা মাথা নাড়ল। 'না।'

'না কি, ঠিক করে বল। উঠে দাঁড়াও দেখি। একটু হাঁটাহাঁটি কর।'

ঝরনা উঠল না। বলল, 'আমার কোথাও লাগে নি, দাদা।'

'কি করে বুঝছ না দাঁড়িয়ে। দাঁড়াও আগে।'

ঝরনা উঠে দাঁড়াল। পায়ের গোড়ালিতে সামান্য লেগেছে। সে-কথা বলল না ঝরনা। হেঁটে হেঁটে ঘরের কাছটিতে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কোথাও লাগে নি।'

মোহিত আর কিছু বললে না। কিন্তু তার চোখ তো আর অন্ধ নয়। ঝরনার পা টেনে চলাটা তার লক্ষ্যে পড়েছে।

ঝরনা ঘরে ঢুকল। মোহিতও বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে থেকে বাতিটা নিভিয়ে দিল।

মনটা খুঁত খুঁত করছিল। আছাড়টা বড় কম খায় নি ঝরনা। বাস্তবিকই কোনো ফ্রাকচার হল কি না কে জানে। হাড়গোড় না ভাঙলেও গায়ে ব্যথাটা যে খুবই হবে কাল সকালে সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

মোহিতের মনে পড়ল, এই ঘরেই তার নিজের কয়েকটা হোমিও-প্যাথী ওষুধ আছে। মাথা ধরলে, কি হজম না হলে দু'চারটে বড়ি সে খেয়ে ফেলে। একটা আর্নিকা মণ্ট আছে। ঠিক, কব্জি মচকে গিয়েছিল তার ক'দিন আগে—চলন্ত ট্রামে উঠতে গিয়ে। কী ব্যথা! মোহিত আরনিকা খেয়ে সেটা সারিয়ে ফেলল।

ওষুধের শিশিটা খুঁজে নিতে দেরি হল না। মোহিত শিশিটা মুঠোয় নিয়ে বাইরে এল। মণ্টুদের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মণ্টুর নাম ধরেই ডাকবে ভাবছিল, হঠাৎ মণ্টুর গলা শোনা গেল।

মণ্টু বলছিল ঝরনাকে, 'কেমন যাও অন্ধকারে বাইরে। গোড়ালিটা গেছে তো! ভালই হয়েছে।'

'তা আমি কি করব।' ঝরনার গলা, 'দাদা যে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর সামনে আলো জেবলে কলঘরে যেতে বাপু আমার বড্ড লজ্জা করে।'

'হ্যাঁ—দাদার আর খেয়ে দেয়ে কাজ ছিল না!' মণ্টু তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল।

'ওই তো তোমার দোষ, না জেনেই কথা বলবে। আমি দেখেছি। গরমে বোধ হয় ঘুমুতে পারছিলেন না। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজ ওই জন্যেই তো ঘরের বাতিটা পর্যন্ত জবাললাম না।'

আর দাঁড়াল না মোহিত। আরনিকার শিশিটা মুঠোয় নিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে এল নিজের ঘরে।

শেষ রাতের আগে চোখে আর ঘুম আসে নি সে-দিন। মনটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল।

পরে মোহিত ভেবে দেখেছে, মণ্টুর বউয়ের এইসব লজ্জা, সংকোচ,

ভয়, শ্রদ্ধার কোনো মানে হয় না। যে মেয়ে প্রেম করে বিয়ে করে, তাও আবার সই করা বিয়ে—সে মেয়ের পক্ষে ভাশুরের সামনে বসে গল্প করতে, কি কথা বলতে, হাসতে, বেড়াতে যেতে অথবা তার সামনে দিয়ে আলো জেবলে বাথরুমে যেতে লজ্জা করার বাস্তবিক কি কোনো অর্থ হয়। কিছু না, কোনো অর্থ হয় না। এ-সব হচ্ছে ন্যাকামি, ছুতো। স্বামী এবং নিজের শোওয়ার ঘরটি ছাড়া মণ্টুর বউয়ের মত মেয়েরা সংসারের আর কিছুতে মাথা গলাতে চায় না। শ্রদ্ধা, সমীহ, ভয় ইত্যাদির অজুহাতে মণ্টুর বউ তাকে পাশ কাটিয়ে থাকে। অথচ মোহিত যদি না বলত, অসম্মতি জানাত—স্বামী নিয়ে এত বেড়ান-চেড়ান সুখ-সোহাগ, নীল বাতি জেবলে গল্প, ফ্যান ঘুরিয়ে শোওয়া চলত না। কোনো এ'দো বস্তি-বাড়ির গুমোট ঘরে তোমাদের মধু-যামিনী কাটত, বুঝলে ঝরনা! কথাটা ঝরনাকে যেন বুঝিয়ে শুনিয়ে বলল মোহিত মনে মনে, তোমার সত্তর-টাকার স্বামীর পক্ষে এই কলকাতা শহরে এখনকার দিনে এত সুখ সচ্ছলতা জুগিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল না।

সংসারটাই স্বার্থপর। সবাই চায় তুমি দাও; আমি নেব। বাবা কোন যুগে রিটায়ার করে বসে এখন সদগুরু-সঙ্ঘ আর নিমাই চরিত নিয়ে দিব্যি সময় কাটাচ্ছেন, বউয়ের হাতে ফুলকো লুচি, ঘন দুধ খাচ্ছেন—এবং গড়গড়ায় তামাক টানছেন। মা-র সর্বক্ষণ চিন্তা বাবা, তাঁর শরীর স্বাস্থ্য সুখ সুবিধে—অন্য ভাবনা রেবার বিয়ে। এ-ছাড়া বাস্তবিকই আর কিছু ভাবে না মা। রেবা তার খাওয়া ঘুম, গল্পের বই আর স্কুল নিয়ে আছে। মাঝে মাঝে মোহিতের কাছে এসে আব্দার এটা দাও, ওটা দাও। সংসারের ঘানিটা বলদের মতন মোহিতই টেনে চলেছে।

ইচ্ছে করলে সংসারের এই সরল টানা স্রোতটা যে মোহিত একদিনেই উল্টো মুখে ঘুরিয়ে দিতে পারে—এটা কি ওরা জানে না—বাবা, মা, মণ্টু বা মণ্টুর বউ!

মোহিত ঠিক করে ফেলেছে—এটা সকলকে—এ-বাড়ির সকলকেই জানিয়ে দিতে হবে যে, যার পরিশ্রম এবং ভালমানুষীর সুযোগ দু'হাত পেতে তোমরা নিচ্ছ তাকে, তার মর্জি এবং সুখ সুবিধেকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস যেন তোমাদের না হয়।

ইলেকট্রিক বিল নিয়ে মা-র সঙ্গে খানিকটা কথা কাটাকাটির পর শনিবারের বাকি দুপুর এবং বিকেলটা মোহিতের বিছানায় শুয়ে দশ-রকম কথা ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল।

বিকেল পড়ে এল। গুমোটটা তবু কাটল না মন থেকে। নীরজা চা দিয়ে গেছেন, জল খাবারও। মোহিত চা-টা শুধু খেয়েছে। ঘরে বসে বসেই শুনেছে, বাবা লাঠি হাতে পার্কে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। পার্কে বেড়িয়ে, কালী মন্দিরে খানিক বসে ফিরতে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যে হবে। মণ্টুর বউ এখনও ফেরে নি। মাকেই উনুন ধরিয়ে রান্না ঘরে ঢুকতে হয়েছে। এর জন্যে নীরজার গজগজটা কানে আসছিল। আজ যেন উষ্মা এবং অভিযোগটা বেশ বেড়েছে। অনেক কথাই মোহিতকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা হচ্ছে।

বিকেল পড়ে গেল দেখে মোহিত উঠল। বারান্দার তার থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে কলঘরে চলে গেল।

স্নান শেষ করে ফিরে মোহিত বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, নীরজা এক গ্লাস লেবুর সরবৎ হাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সরবতের গ্লাসটা নীরজার হাত থেকে নিতে গিয়ে মোহিত বলল, 'রেবাও কি ওদের সঙ্গে গেছে?'

'হ্যাঁ, আর বল কেন। মেয়ে তো সব সময় পা বাড়িয়েই রয়েছে। আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না।' নীরজা বিরস মুখে বললেন। 'বউমা নাচিয়েছে ওকে, আর কি রাখা যায়।'

'খুব রাখা যায়।' মোহিত গম্ভীর ধীর গলায় বলল, 'মণ্টুর বউ তার বরকে নিয়ে যেখানে খুশি যাক, কিন্তু আমাদের বাড়ির মেয়েকে টেনে যেখানে খুশি যেন না নিয়ে যায়।' সরবতের গ্লাসটা শেষ করে ফিরিয়ে দিল মোহিত।

নীরজা নড়লেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

মোহিত যখন বেরুতে যাচ্ছে, নীরজা বললেন, 'সেই চিঠিটা একবার দেখে রাখলে না! তোমার বাবা তো আবার ফিরে এসে আমায় জ্বালিয়ে খাবে।'

'কোন চিঠি!' মোহিত মুখ তুলে বলল।

'তোমার বাবার নামে যেটা এসেছে আজ। আনছি।'

মোহিত যখন বারান্দায়, নীরজা চিঠিটা এনে মোহিতের হাতে

দিলেন। চিঠিটা পড়ল না মোহিত তখুনি। পকেটে রেখে দিল। তারপর বেরিয়ে গেল। ঝরনারা তখনও ফেরে নি।

অন্যান্য দিনের তুলনায় খানিকটা রাত করেই ফিরল মোহিত। দশটা প্রায় বাজছে তখন। নীরজা আর মণ্টুর বউ হেঁসেল আগলে বসেছিল।

খেতে বসে যা দু-দশটা কথা বললে মোহিত তাতে নীরজার মনে হল মেজাজটা পড়ে গেছে ছেলের। ঝরনা দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, শাশুড়ীর কথা মতন এটা সেটা এগিয়ে দিচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল ওর ঘরের দিকে। যা হুড় গেছে আজ সারা দুপুর আর বিকেল—মানুষটা না ঘুমিয়ে পড়ে সাত-তাড়াতাড়ি।

মোহিতের খাওয়া দাওয়া সারা হল। মশলা চিবোতে চিবোতে সিগারেটটা শেষ করল ঘরে বসে। তারপর ধীরে ধীরে মণ্টুর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল।

'মণ্টু কি ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

'না, ঘুমোই নি। এস না—।' মণ্টু শুয়েছিল। উঠে পড়ল বিছানা থেকে।

ঘরে ঢুকল মোহিত। ঢুকে ঘরটার চারদিকে একবার চোখ বুলোলে। বাঃ, বেশ ফিটফাট রেখেছে ঘরটা। নীল বাতিটা জ্বলছে। ফ্যানটা ঘুরছে মাথার ওপর। রঙকরা পরদাগুলোর তলাটা উড়ছে থেকে থেকে। দেওয়ালে আর একটা নতুন ছবি টাঙানো হয়েছে।

বেতের মোড়াটায় বসল মোহিত। 'কোথায় গিয়েছিলি দুপুরে আজ?'

'ঝরনাদের বাড়ি।' মণ্টু দাদার মুখোমুখি বসে খুব সহজ গলায় জবাব দিল।

মোহিত কি ভাবল। 'তোর শ্বশুরবাড়ির লোকে এখন আর কোনো অশান্তি করছে না তা হলে! ব্যাপারটা মেনেই নিয়েছে!'

'হ্যাঁ—আবার কি করবে; বিয়ে-থা হয়েই গেল যখন।' মণ্টু দাদার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল।

'ভাল। ভালই করেছে। বাজে ব্যাপার নিয়ে বেশি টানা হেঁচড়া করা উচিত নয়।'

একটু চুপচাপই। মোহিত এই ঘরটা দেখছিল। কিছু নেই, তবু কী যেন আছে। এক সময় মোহিত যখন এ-ঘরে বছরের পর বছর থেকেছে তখন ঘরটা তার কাছে নিছক একটা ইঁট কাঠ চুন সুরকির স্তূপ ছাড়া কিছু মনে হত না, কিন্তু এখন অন্য রকম মনে হয়। যেন এ-ঘরটার বাতাসই আলাদা, বিশ্রাম করতে, বসতে, ঘুমুতে ইচ্ছে করে।

'তোকে একটা কথা বলতে এলাম।' মোহিত ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল, 'আমাদের অফিসে ট্রান্সফারের খুব হিড়িক পড়েছে। তা প্রায় জনা তিরিশকে এখান থেকে টেনে নিয়ে মোরাদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, শিলং, গৌহাটি পাঠাচ্ছে। আমাকে বলছিল, শিলং যেতে। একটা প্রমোশনও দেবে। তা ছাড়া অ্যালাউন্সও কিছু বাড়বে। কি করি বল তো? আমি অবশ্য হাঁ-না কিছু বলি নি ওদের।'

'শিলং—! সে তো খুব ভাল জায়গা—রাজী হয়ে যাও।' মণ্টু নিজেই উৎসাহিত বোধ করলে।

মোহিত ভাইয়ের দিকে অবাক চোখে তাকাল। 'জায়গা ভাল, কিন্তু আমি ওখানে থাকব—তোরা এখানে—দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট—। আমার আবার হোটেল-ফোটেল একদম স্যুট করে না, জানিসই তো।'

'হোটেলে থাকবে কেন তুমি? বাবা মা রেবাকে নিয়ে যাবে।' মণ্টু দাদার চোখের দিকে খোলামেলা ভাবে চাইল।

মোহিত এটা আশা করে নি। মণ্টু কি সব জেনে শুনে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, মোহিতের থাকা না-থাকায় মণ্টুদের কিছু যায় আসে না! এই জবাব ভাল লাগল না মোহিতের। কথাটা আরও স্পষ্ট খোলাখুলি করে জানবার জন্যে বললে, 'এক সংসারে আছি বলে সব হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি বাবাদের নিয়ে চলে যাই, তুই—মানে তোর ইন্‌কামে—তোদের দু-জনের কুলিয়ে যাবে?'

'মাথা খারাপ তোমার।' মণ্টু ঠোঁটে একটু হাসল, 'সত্তর টাকায় কি কুলোয় নাকি! তবে চেষ্টা-টেষ্টা করে আরও কিছু রোজগার বাড়ালে—অল্পসল্প ভাড়ায় একটা বাড়ি যোগাড় করতে পারলে—কোনো রকমে কুলিয়ে যাবে।'

মোহিত স্তব্ধ। ভাইয়ের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিতেও পারছিল না। এই ঘরের মতন, মণ্টুর মুখটাও যেন কত বদলে গেছে।

মণ্টুর ওপর রাগ হয়েছিল আগে, এখন আর রাগ নয়—দুঃখ, অদ্ভুত

একটা দুঃখ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল না যে, মণ্টু তাকে তেজ দেখাচ্ছে—উপার্জনের কেরামতি রাখে বলে বৃথা বড়াই করছে—কিছুই না; মণ্টু শুধু জানাচ্ছে, দাদার সাহায্য না পেলেও তাদের দুটি প্রাণীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা সে কোনো রকমে করে নেবে। এর বেশি কিছু না।

মোহিতের যেন সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল। মোড়া ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘ নিশ্বাসটা বুকে চেপে বাইরে বেরিয়ে এল।

বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল ঝরনা। হেঁশেল তুলে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মোহিত একবার শুধু সেই শান্ত, স্থির মূর্তিটা দেখল—তারপর ওর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

আজও ঘুম আসছিল না। নিজেকে বড় বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল মোহিতের। যেন এ-সংসারের ভালমন্দ, সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনার সাধারণ স্তর থেকে তাকে সকলেই আলাদা করে দিয়েছে। বাবা-মা তাঁদের ইহকাল আর পরকালের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা নিয়ে রয়েছেন, রেবা তার বর্তমানটাকে খুব বেশি ছুঁয়ে নেই, ভবিষ্যতের দিনকে সে ছুঁয়ে রয়েছে; মণ্টু আর মণ্টুর বউ তাদের জীবনকে সহজ ভাবে নিয়ে নিয়েছে, কোনো বড় স্বপ্ন নেই, অযথা মোহ নেই—দুঃখের ভয় নেই, দুর্দিনের জন্য ছটফটিয়ে মরছে না আগে থেকেই। যেন কালকের কথা কাল, আজ তার জন্যে আমি গালে হাত তুলতে যাব না।

ঘুম আসছিল না বলে মোহিত কয়েকবারই উঠে উঠে জল খেল আর বাইরে এল। বাথরুমে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার কথা আর ওঠে না—সে-দিন থেকে।

বার কয়েক আসতে যেতে হঠাৎ খেয়াল হল। মণ্টুদের ঘরে বাতি অবশ্য এত রাতে আর জ্বলার কথা নয়, কিন্তু পাখাটা—সেটাও তো কই ঘুরছে না। ঘুরলে ওই পাখার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা কানে আসতই। কিন্তু কানে আসছে না। মোহিত যখন মণ্টুর ঘরে গিয়েছিল তখনও চলছিল পাখাটা। ঝরনা ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিয়েছে নিশ্চয়।

মোহিত বুঝতেই পারল, রাত্রে খেতে বসে—ঝরনাকে মা নিশ্চয় বলেছে, ইলেকট্রিক বিলটার কথা। মা তো বলেই ছিল, বলবে কথাটা মণ্টুর বউকে।

সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। মোহিত গিয়ে মণ্টুকে ট্রান্স্‌-ফারের কথা বলেছে, আর মা মণ্টুর বউকে বলেছে ইলেকট্রিকের বিলের

কথা। এরপর মণ্টু বা মণ্টুর বউ কি ভেবেছে এবং কোন আলোচনা করেছে—করা সম্ভব তা বোঝাই যাচ্ছে।

দুঃসহ একটা গ্লানি বোধ করছিল মোহিত। মণ্টু বা মণ্টুর বউকে সত্যিই কি সে এ-বাড়ি থেকে—তাদের কাছ থেকে সরিয়ে আরও অভাব, দুঃখ, কষ্ট আর মালিন্যের মধ্যে ফেলে দিতে চায়? যেখানে গেলে আরও মোটা চাল, পচা কিংবা আধপচা মাছের ঝোল ঝাল খেতে হবে, যেখানে এমন বাড়ি, নিজেদের কলতলা জুটবে না—নীল বাতি কিংবা পাখা কিছুই নয় এবং যেখানে দমবন্ধ অন্ধকার আর গরম আর ভ্যাপসা বাতাস—মণ্টু আর মণ্টুর বউকে কি সেখানে ঠেলে দিতে চাইছে মোহিত?

কেন? কিসের জন্যে? মোহিত অন্ধকারে বিছানার ওপর ছটফট করছিল এবং ভাবছিল কেন? এই নিষ্ঠুরতা কেন? মোহিত নিজেকে বার বার প্রশ্ন করছিল। জবাব পাচ্ছিল না।

সকালে চা খেয়ে কাগজ দেখতে দেখতে নীরজাকে ডাকল মোহিত।

নীরজা হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালেন।

মোহিত মার দিকে না চেয়েই বলল, 'বাবার চিঠিটা আমি দেখেছি। ওটা নিয়ে যাও। টেবিলের ওপর আছে।'

চিঠিটা খোঁজবার অছিলা করে টেবিলের সামনে গিয়ে নীরজা খানিকটা দাঁড়ালেন। ছেলের দিকে বার কয়েক চেয়ে বললেন, 'তা এ-চিঠির জবাব তো দিতে হবে।'

কাগজ থেকে মুখ তুলল না মোহিত। বলল, 'দিয়ে দাও।'

'জবাবটা না হয় তোমার বাবা লিখবেন, কিন্তু কি লিখবেন সেটা তো জানা দরকার।'

মোহিত কাগজের মধ্যে খুব আশ্চর্য কোনো খবর দেখতে পেয়ে যেন ঝুঁকে পড়ল। এবং কোনই আগ্রহ নেই এমন সুরে বলল, 'জবাব আবার কি—লিখে দেবে ও-সব হবে না। বিয়ে ফিয়ে আমি করব না। এ-বয়সে আবার বিয়ে!' একটু থামল মোহিত, নীরজার দিকে একবার চেয়ে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমি তো আর মণ্টুবাবু নই যে. বউকে কোনো রকমে দুটো ডাল ভাত খাওয়াবার সামর্থ্য থাকলেই ভাবব আর কি, খুব ক্ষমতা হয়েছে আমার। না মা, ভদ্র ভাল সুন্দর সচ্ছল জীবন কাটাবার মতন যার ক্ষমতা নেই তার পক্ষে বিয়ে করা

অনুচিত। পাপ! বউকে ডাল ভাত খাইয়ে সুখী করা যায় না। ছেলেপুলেকে বার্লির জল খাওয়ালেই কর্তব্য পালন করা হয় না। ও-সব মন্টুবাবু পারতে পারে। আমি পারি না।'

নীরজা আর কিছু বললেন না।

আঙুরলতা | যযাতি

যযাতি

বায়না করতে নয়, আগেভাগে একটা আঁচ নিতে এসেছিল ওরা। খুব একটা ভরসা নিয়ে আসে নি। পাঁচজনের মুখে যা শোনা গিয়েছিল, তাতে ভরসা পাবার কথা নয়। এই বয়সে বউ মরলে এমনিই হয়; সব ব্যাপারেই ছাড়ো-ছাড়ো আড়াল-আড়াল ভাব। মন বসে না আর—সে সংসারেই হোক কি কাজকর্মে। নেশা, শখটখ আমোদ-আহ্লাদ তো পরের কথা।

ফটিক আঘোরী দু-দশটা কথার পর খুব সাবধানে, সসংকোচে আসল কথাটা তুললে। 'বাসনা তো খুবই ছিল গো ঠাকুরমশাই—ই বারে মায়ের থানে আসরটা দি।' ফটিক এমন একটা হতাশার সুর টানল যেন অত সাধ-বাসনার সবটাই বিফলে গেল।

ফটিক আঘোরী আর তার দলবলের দিকে তাকিয়ে নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বললে, 'বাধছে কিসে তুমাদের?'

বাধছে আসল জায়গায়। মূর্তি না থাকলে যেমন পুজোয় বাধে, পিঁড়িতে বর না বসলে যেমন বিয়েতে—তেমনি। আসরটা তো ফটিক আঘোরীরা বসাবে, কিন্তু সে মরা-আসর জমাবে কে ছাই, যদি না নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য একটা যাত্রার পালা গায়। ফটিক আঘোরী বেশ গুছিয়ে কথাটা পুরোপুরি বলে ফেললে।

নীলকণ্ঠ মনে মনে অবাক হচ্ছিল। এই কথা, এর জন্যে আঘোরীর অত ইজল-বিজল কেন?

নীলকণ্ঠর গোল, ভরাট, তামাটে মুখের গোড়ায় বেশ একটু কৌতুক আর হাসির ছোঁয়া লাগল। ঈষৎ লালচে চোখ আর ধূসর মণি দুটো ফটিক আঘোরীর রোগাসোগা মুখের উপর রেখে নীলকণ্ঠ বললে, 'আমি পালা গাইব না, এটা তুমি ঠাওরালে কী করে হে আঘোরী?'

'আমি কিছু ঠাওরাই নাই ঠাকুরমশায়।' ফটিক মাথা নেড়ে দু-হাত প্রায় করজোড়ের ভঙ্গিতে বুকের উপর তুলে ধরে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'ই ছোঁড়াদের বিশ্বাস আসছিল না।' সঙ্গীদের দেখিয়ে দিল ইশারায়,

'দোষ নাই উদেরও, যা শোকতাপ গেল আপনার, পালাটোলা ফিরে আবার গাইবেন বিশ্বাস লাগে না। হ্যাঁ, তবে কিনা—'

নীলকণ্ঠ বাধা দিল ফটিকের কথায়। বললে, 'যতদিন গলা আছে, বুঝলে আঘোরী, পালা আমি গাইব; আর হাতে খাগের কলমটা যতদিন আছে, পালাও আমি লিখব জেনে রাখ তুমি।'

ফটিক তাড়াতাড়ি আসল কথাটা শুধল, 'নতুন পালা কিছু লিখলেন নাকি ঠাকুরমশায়?'

নীলকণ্ঠ মাথা নাড়লে। না লেখে নি।

ফটিক সুযোগটা হারাতে চায় না। মুখের হাসিটা আরও বিনীত করে বলল, 'যদি অন্তরের কথাটা শোনেন ঠাকুরমশায়, তবে বলি, আমাদের ইচ্ছাই ছিল এবার মার থানে একটা নতুন পালা জমাই, তাই তো এলাম আপনার কাছে।' অল্প একটু থামল ফটিক, নীলকণ্ঠর মনোভাবটা বোঝবার চেষ্টা করল; তারপর বলল, 'তা বাসনাটা আমাদের পূর্ণ করেই দেন না হয়!'

নীলকণ্ঠ আধ-শোওয়া ভঙ্গিতে বসে ছিল। ফটিক আঘোরীর দেওয়া সিগারেটে টান দিতে দিতে চোখ দুটি একটুক্ষণের জন্যে বুজল। চোখ খুলে বলল, 'হবে গো আঘোরী, তোমাদের আসরের জন্যে নতুন পালা একটা লিখব। কাজকর্ম তো আজকাল ছেড়েই দিছি। বেটার ঘাড়ে চাপাইছি সব। সময় আছে হাতে। হবেখন।'

'তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই?' ফটিক কথার জন্যে নীলকণ্ঠের মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকল।

মাথা নাড়ল নীলকণ্ঠ। হ্যাঁ, ফটিক নিশ্চিন্ত হতে পারে।

সঙ্গের দলবলের দিকে কৃতিত্বের একটা কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে ফটিক উঠে দাঁড়াল, 'বায়নাটা তবে চটপট করেই যাব ঠাকুরমশায়।'

নীলকণ্ঠ ঘাড় নাড়ল। 'করে যেও বায়না; যবে খুশি, যখন খুশি।'

ফটিক চলে যাওয়ার পর নীলকণ্ঠ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল, তেমনি আধ-শোওয়ার ভঙ্গিতেই। পশ্চিমের জানলাটা খোলা। ঢেঁড়স আর কলাগাছের ঝোপটা বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। যদিও ডোবাটা দেখতে পাচ্ছিল না নীলকণ্ঠ, তবু ডোবার ও-পারে ধুঁধুল গাছের একটু যেন চোখে পড়ছিল। বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল। ভিজে লতাপাতার

একটা গন্ধ ঢুকছিল ঘরে। আর ময়না, চড়ুই, কাকের কিচিরমিচির।

নতুন একটা পালা লিখতে হবে। এবার কী পালা লেখা যায়, নীলকণ্ঠ শূন্যচোখে তাকিয়ে সেটা যেন ভাবছিল। এর আগে অন্তত আট-দশটা পালা লিখেছে। রাম লক্ষ্মণের পালা থেকে শুরু করে সিংহল বিজয়ের পালা পর্যন্ত। দু-চারটে বেশ ভালই উতরে গেছে। সেইসব পালা শুধু ধুনুরি গ্রামে নীলকণ্ঠর কালী অপেরাই নয়, আশে-পাশের অনেক গাঁয়ে অন্য দলও গেয়েছে। যেগুলো উৎরায়নি, নীলকণ্ঠ নিজেও আর সেগুলোর নামোচ্চারণ করে না। করতে লজ্জা পায় যত না, তারচেয়ে বেশি বিরক্ত হয়। কেমন একটা আক্রোশে গরগর করে। নিজের উপরেই। নিজের অক্ষমতা এবং ব্যর্থতার উপরেই যেন এই বিরক্তি, ঘৃণা।

নীলকণ্ঠ ভাবছিল, নতুন পালা কী নিয়ে লেখা যায়। একবার আচমকাই মনে হল, দক্ষযজ্ঞের ঘটনা নিয়ে লেখা যেতে পারে। সতীর দেহত্যাগ। বিষয়টা ভাল। নীলকণ্ঠ নিজেই মহাদেবের পার্টটা করতে পারবে। আর এই সময়—সদ্য সদ্য নারায়ণীর মৃত্যুর পর—নীলকণ্ঠ বোধ হয় দু-চারটে জায়গায় বেশ লিখতে পারবে, চুটিয়ে পার্ট করতেও হটবে না। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবের অবস্থাটা মনে মনে কিছু-ক্ষণ কল্পনা করে নিল নীলকণ্ঠ। একটা দৃশ্যই যেন ছকে ফেলল। সতীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে মহাদেবের বিচলিত অবস্থা; শোকের স্বগতোক্তি আর রোষ। দুটি ছত্র মুখেই এসে গিয়েছিল।

নীলকণ্ঠের মনের সুতো হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। অন্দরমহল থেকে সন্ধ্যে দেবার শাঁখ বেজে উঠেছে। বেজে বেজে থামল। নীলকণ্ঠ খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে থাকল। দাওয়ার অন্ধকারে এখুনি একটু আলোর ছিটে পড়বে।

কুসুম তবে এসে গেছে। না হলে শাঁখ বাজাবে কে? ললিত বাইরে। গাঁয়ে দু-ঘর আর ক্যাশিয়ারবাবুর বাসা, তিন ঘরে সত্যনারায়ণ পুজো সারতে হবে তাকে। বিকেল থাকতেই বেরিয়ে গেছে, বৃষ্টিতেই। মাধু শ্বশুরবাড়ি। সেই যে তার মা-র শ্রাদ্ধর পর গেছে, দেড়মাসের মধ্যে আর এ-বাড়ি আসে নি। বলাইটা বাচ্চা, বছর আষ্টেক বয়েস; এখনো হয়ত চট্টরাজের বাসায় খেলছে। তা ছাড়া সে তো আর শাঁখ বাজাতে পারে না। কুসুমই এসেছে তা হলে। মাসখানেক ধরে ঘরে

সন্ধ্যে দেওয়ার কাজটা সে-ই সেরে দিচ্ছে।

নীলকণ্ঠ দাওয়ার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। আলোর ছিটের আশায়। একটু পরে সত্যিই একটু আলো পড়ল। দাওয়া দিয়ে কুসুম হাত আড়াল দিয়ে প্রদীপ ধরে সদরে গেল, সদর থেকে রান্নাঘরে, এদিক-ওদিক। আবার অন্ধকার। অল্পক্ষণ পরে টিমটিমে একটা কুপি এনে কোথায় বুঝি ঝুলিয়ে দিল। দাওয়ার একটা এবড়ো-খেবড়ো জায়গা এক খাবলা ম্লান আলোয় টিমটিম করতে লাগল। নীলকণ্ঠর মনে হচ্ছিল, পিঠের কুঁজের মত দাওয়ার ওখানটায় যেন কুঁজ গজিয়েছে।

গলার কাশির শব্দ তুলে সাড়া দিল নীলকণ্ঠ। সাড়া না দিয়ে পারছিল না। ছোট লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নিয়ে কুসুম এল। চৌকাঠের ও-পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা ঘরের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

নীলকণ্ঠ শুধল, 'বলাইটা ফিরেছে নাকি?'

মৃদু-গলায় জবাব দিল কুসুম, 'হ্যাঁ ফিরেছে।' সরে যাবার মতন একটু নড়ে চড়ে উঠলেও কুসুম সরে গেল না। নীলকণ্ঠ আর কী বলে, যেন তা শোনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল।

নীলকণ্ঠ বললে, 'পাকঘরে আগুনটাগুন আছে নাকি? টুকুন চা খেতাম।'

কুসুম মাথা-ঘাড় আস্তে একটু নোয়াল। আগুন থাক না থাক, চা সে তৈরি করে দিচ্ছে।

কুসুম চলে গেল। নীলকণ্ঠ জ্বলন্ত লণ্ঠনটার দিকে চেয়ে থাকল ক'পলক। কুসুমের চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছিল। বেশ ডাগর-ডোগর মেয়েটা। সুশ্রী। খুঁত আছে একটু, অন্ধকারে ধরা পড়ে না। চিবুকের নীচ থেকে গলা বেয়ে কণ্ঠার কাছাকাছি পর্যন্ত মস্তবড় একটা দাগ। ডান দিকে। গলার মধ্যে ঘা হয়ে নাকি বিষিয়ে গিয়েছিল, কাটাকুটি সেলাই-ফোঁড়াই করতে হয়েছিল। তারই দাগ। কুসুম গায়ের কাপড়টা সবসময়ে গলার উপর দিয়ে টেনে দাগটা চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। পারে না। এই খুঁতের জন্যে বিয়েও হচ্ছে না মেয়েটার।

নীলকণ্ঠ বেশ ঠাওর করে দাগটা দেখবার চেষ্টা করেছিল আজ, একটু আগেই; দেখতে পায় নি। অতটা দূরে আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুই ভাল করে দেখা যায় না।

নীলকণ্ঠ খানিকটা চুপচাপ বসে থেকে একটা বিড়ি ধরাল। বলাইটা

ফিরেছে খানিক আগেই, তার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। কুসুমের কাছে দাপাদাপি করছে ছোঁড়াটা।

পালা লেখার কথাটা আবার মনে এল। কী যে লেখা যায়! দক্ষ-যজ্ঞের পালাটাই কি লিখবে নাকি?

চা নিয়ে এল কুসুম। নীলকণ্ঠ আঠার বছরের এই সু-গড়ন মেয়েটাকে আরও একবার ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলে।

'বুঝলে কুসুম, কড়িগাঁ থেকে ফটিক আঘোরীরা এসেছিল।' কুসুম চলে যেতে যেতে দাঁড়াল নীলকণ্ঠর কথায়। ফিরে তাকাল। নীলকণ্ঠ হাসি হাসি মুখে বললে, 'পালা গাইতে চায়। বলে একটা নতুন পালা লেখেন ঠাকুরমশায়।' নীলকণ্ঠ কথাটা যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল। ঈষৎ গর্বভরে।

কুসুম চৌকাঠের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এই দিকেই তাকিয়ে ছিল, নীচু মুখে। চুপচাপ। গালের আর গলার একটা পাশে খানিকটা অন্ধকার ভরাট হয়ে ছিল।

নীলকণ্ঠ আর কোনো কথা বলছে না দেখে কুসুম আস্তে আস্তে চলে গেল।

চা খেতে খেতে নীলকণ্ঠ কুসুমের সরে যাওয়া চুপচাপ লক্ষ্য করলে। পালা লেখার কথাটাও ভাবতে লাগল। দক্ষযজ্ঞের বিষয়টা একবার মনে হয়েছিল মাত্র, কিন্তু বিষয়টায় তেমন কোনো আকর্ষণ পাচ্ছিল না। বড় পুরনো, আর সেই এক সতী, সতী। কোনো রস নেই। বউ মরল তো খ্যাপামি। না, নীলকণ্ঠর এ-সব ভাল লাগে না। মরণ—মরণ; তার জন্যে এত হৈ হৈ করার কী আছে! ধুলোয় গড়াগড়ি দেবার, লুটোপুটি খাবার কী মানে!

না, নীলকণ্ঠর এ-সব পছন্দ নয়। এ-পৃথিবীতে যে-কদিন আছ, আনন্দ করে থাক। যার যেমন সামর্থ্য, তেমনি। সুখ পাওয়াটাই বড় কথা, শোকতাপ পাওয়াটা নয়। তা যদি পেতে চাও, তবে ভিখিরি হও, ভদ্রলোক হওয়া কেন? কেন এই জমিজমা আগলানো, সংসার পাতা, বাড়ি-বাড়ি চাল-কলা গামছার জন্যে হাঁটাহাঁটি!

নীলকণ্ঠ বোধ হয় ব্যাপারটা ভাল করে বুঝেসুঝে সব ছেড়ে দিয়েছে। বৃত্তিটা পর্যন্ত। এই গাঁয়ের একমাত্র যাজক বলতে গেলে, পুজো-পার্বণ তো লেগেই ছিল। আজ শনি, কাল সত্যনারায়ণ, পরশু

দুর্গা, তরশু কালী, বার মাসে তেরো কেন, তেইশ পার্বণ। উপবাসের পর উপবাস কর, দিন নেই রাত্রি নেই, বর্ষা-বাদল নেই। আজ এর উপনয়ন তো কাল ওর শ্রাদ্ধ, শুভ দিনের নির্ঘণ্ট খুঁজতে খুঁজতে চোখে ছানি পড়া যোগাড়, পুজোর মন্ত্র পড়তে পড়তে ফুসফুসটা ফুটো হয়ে যাবার অবস্থা। ভাল লাগে নি আর। ভাল লাগত না মোটেই নীলকণ্ঠর। ছেলেটাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। এখন তার হাতেই আস্তে আস্তে সব ছেড়ে দিয়েছে। তা বছর বাইশ বয়েস হতে চলল ললিতের। বেশ কাজের ছেলে। ধর্মেকর্মে মতি আছে, হিসেব-পত্তরেও। যজমানদের বাড়ি যায় যেমন, তেমনি জমি-জায়গা ফলন-টলনের সবটাই দেখাশোনা করে। নীলকণ্ঠ এ-সব ব্যাপার থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে। এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই।

বয়সটা যে যথেষ্ট, নীলকণ্ঠ নিজের দিকে তাকিয়ে তা কোনদিনই মেনে নেয় না। বেঁচে থাকতে নারায়ণী যদি কখনো বয়সের কথা তুলে খোঁটা দিয়েছে, নীলকণ্ঠ ভীষণ চটে উঠত। বলত, 'বয়স আবার কী? যতদিন শরীরে ক্ষুধা আছে, কাম আছে, ভোগের ক্ষমতা আছে, ততদিন মানুষ জোয়ান। যখন থাকবে না, তখন সে জরাগ্রস্ত, অধম, অচল। আমার আবার বয়স কী! নেহাত বামুনের ছেলে, গাঁয়েগ্রামে মানুষ, তাই ফচকে বয়সে বিয়ে হয়েছিল। বাইশ বছর বয়সে তো বেটার বাপ। শহর-টহরে আজকাল তিরিশ পঁয়ত্রিশের আগে বিয়ের কথাই কেউ ভাবে না। তবু তো ওই খড়কে-কাঠি স্বাস্থ্য! আর আমার—?'

নীলকণ্ঠ স্ত্রীকে তার স্বাস্থ্যটা দেখাত। তা স্বাস্থ্যটা ওর বেশ ভালই। না বেঁটে, না লম্বা। মাঝারি। জলফুলো চেহারা নয়; গড়ন-পেটন মজবুত। মুখটা গোল, ছোট কপাল, লম্বা নাক, পাটি-সাজান দাঁত। শরীরের কোথাও এখনো টোল পড়ে নি।

শরীরকে নীলকণ্ঠ ভালবাসত, শরীরকে সে রাখবার চেষ্টা করত। কলা-আতপচালের ভক্ত ছিল না নীলকণ্ঠ; মাংস-মদটাও খেত, দিশী মদ। ধর্মপুজোর গাঠটার এক কোণে যে ইঁট-বারকরা ভাঙা নাট-মন্দিরটা রয়েছে, সেখানে কালী অপেরার মহড়া হত বছরে তিন কি চার মাস, কিন্তু বারমাসই নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য, মদন চট্টরাজ, কেষ্ট চক্রবর্তী আর দু-একজন মিলে আসরটা জমাত। ইঁটের ঠেকা দেওয়া তক্তপোশের উপর ধুলো-ভর্তি সতরঞ্চি বিছিয়ে দাবার সঙ্গে দিশী টিশী চলত।

নীলকণ্ঠ পঁয়তাল্লিশে পেঁাছেও পরিশ্রান্ত হয় নি কেন, এর জবাব সে দিতে পারত। বলত, 'আমি তো গঙ্গাজল ঠোঁটে ঠেকানো বামুন নই, সোমরস পান করা বামুন। বুঝলে হে চট্টরাজ, এখনো বসলে একসের চালের ভাত খেতে পারি—একটা ছোটখাটো পাঁঠা। আর যদি বল বিয়ে থা, কিরে কেটে বলছি রে চট্টরাজ, দুটো বউ তো হেসেখেলে সামলাতে পারি।'

নীলকণ্ঠ পারলেও নারায়ণী পারে নি। পনর বছর বয়স থেকে ছেলে বিয়োতে শুরু করেছিল। প্রথমটা বেঁচে গিয়েছিল কী ভাগ্যে। তারপর তো বছরে বছরে বিয়োয় আর সেগুলো মরে। এরই মধ্যে মাধুটা রক্ষে পেল, এবং শেষ বলতে বলাইটা। বলাইয়ের পর নারায়ণীর আরও তিনটে মরেছে। নিজেও সে• মরল বাচ্চা বিয়োতে গিয়েই। সেপ্‌টিক, তারপর ধনুষ্টংকার।

নীলকণ্ঠ চা-টুকু অনেকক্ষণ আগেই শেষ করে কখন যেন বিড়ি ধরিয়ে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল। বলাইয়ের বিশ্রী একটা চিৎকারে চমকে উঠে নিজেকে ফিরে পেল। আ—ছাই, বাইরে যে বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখন মুখ হাত ধুয়ে জামাটা চড়িয়ে ধর্ম-পুজোর মাঠে গিয়ে পেঁাছতে তো রাতই হয়ে যাবে।

নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। যেতে তাকে হবেই। চট্টরাজদের কাছে আজ ফটিক আঘোরীদের কথাটা বলতে হবে। নতুন পালা লেখার কথা।

নীলকণ্ঠ এলোমেলোভাবে ভাবছিল, কী পালা লেখা যায়, কোন্ পালা। ভাবতে ভাবতে বাইরে বেরিয়ে এল। গামছাটা তুলে নিল দড়ি থেকে। দাওয়ায় নেমে যাচ্ছিল হাত মুখ ধুতে। হঠাৎ রান্নাঘরের কাছাকাছি আসতেই থমকে দাঁড়াল। উনুনটা কাঠ দিয়ে দিয়ে গনগনে করে জ্বালিয়ে নিয়েছে কুসুম। সেই আঁচের মুখোমুখি পিঁড়ি পেতে বসে রয়েছে। গায়ের কাপড়টা একটু আলগা। ওই তাপ যেন সহ্য করতে না পেরে শাড়ি-জামা সামান্য ঢিলেঢালা করেছে।

গামছাটা বুকের কাছে অন্যমনস্কভাবে চেপে ধরে নীলকণ্ঠ তাকিয়ে থাকল।

এমনি হয় মাঝে মাঝে। সব থাকে, তবু হয় না। নীলকণ্ঠর তেমনিই হচ্ছিল। পালা লেখার জন্যে গল্পের কি অভাব আছে! কাশীরাম আর

কৃত্তিবাসের বড় ভক্ত নীলকণ্ঠ। উপখ্যানের পর উপখ্যান তার মুখস্ত। ঋতুপর্ণ, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, যে-কোনো একটা আখ্যান নিলেই হয়। শুধু কাঠামোটা। প্রাণটা তো নীলকণ্ঠর হাতে। লাল খেরো-বাঁধানো খাতায় শরের অথবা পালকের কলমের টানে টানে নীলকণ্ঠ তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। সে-ক্ষমতা তার আছে।

কিন্তু আশ্চর্য, কোনটাই নীলকণ্ঠর মনোমত হয় না। কোনো উপাখ্যানই নয়। আজ হয়ত মনে মনে একটা পছন্দ করে, কাল ভাবতে বসে সেটা বাতিল করে দেয়। বিদুরকে নিয়ে একটা পালা প্রায় ছকে ফেলেছিল নীলকণ্ঠ, কিন্তু কি মনে করে আর লিখল না। না, অত ধর্মটর্ম-করা মানুষ নিয়ে তার চলবে না। মানুষটার কোনো তেজ নেই, বীর্য নেই, ক্রোধ নেই। যেন গাছ কিংবা পাথর। নীলকণ্ঠর আবার এ-সব পছন্দ হয় না। কটা পালা লিখেছে আগে, এদের মতন মানুষ নিয়ে কিন্তু দেখাই গেছে, ভাল জমাতে পারে নি। তেমন কোনো প্রাণের টানই পায় না নীলকণ্ঠ এইসব সরল সাদামাটা মানুষের কথা লিখতে বসে।

নীলকণ্ঠর পছন্দর ধরনটা অন্যরকম। ‘মন্দ যদি না থাকল তবে মানুষ কী হে’, চট্টরাজ, রায়—এদের বোঝাত নীলকণ্ঠ, ‘আমরা স্বর্গে থাকি না হে, মর্তে থাকি। এখানে মায়ে-মেয়েতে সতীন-মতন হয়, বাপে ছেলেতে লাঠালাঠি করে, ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা লড়ে—বুঝলে! উ সব যুধিষ্ঠির-টুধিষ্ঠির নয়, উরা কি মানুষ নাকি! হ্যাঁ লেখ দিকি একটা পালা দুর্যোধনকে লিয়ে, কি দুঃশাসনকে—জমে যাবে। কেনে, আমি যে কৈকেয়ি পালাটা লিখেছিলাম গো, দেখলে তো কতবার গাইলাম পালাটা।’

মুশকিল এই যে, নীলকণ্ঠর পছন্দমতন চরিত্র কি আখ্যান যা ছিল আগেই ফুরিয়েছে। এখন আর নতুন করে কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ ফটিক আঘোরীরা সময়মতন বায়না করে গেছে। নীলকণ্ঠ টাকাটা নিয়েছে, কাগজে সইও দিয়েছে। ফটিক আঘোরীকে এ-কথাটা বলতে পারে নি নীলকণ্ঠ যে, তার মাথায় আর নতুন পালা আসছে না। বলা মানে তো নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া। আঘোরীকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, নীলকণ্ঠর ক্ষমতা সত্যিই গেছে।

নীলকণ্ঠ তা পারে না। ভাবতেও তার আপত্তি। এটা নিছকই

ভাগ্য যে, ঝমনের ঘরে জন্ম নিয়েছিল নীলকণ্ঠ, তার সাত পুরুষের বৃত্তিটাই ছিল যাজকের, গামছায় শালগ্রাম বেঁধে ঘরে ঘরে ঘণ্টা নাড়তে আর চাল কলার সিধে আনতে যাওয়া। নয়ত আসলে ও অন্য মানুষ। স্বভাবে খানিকটা নাস্তিক, খানিকটা অবিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়ী, সুখ আর ভোগের প্রত্যাশী। আর মনে মনে মানুষটা শিল্পী। শিল্পী ছাড়া কী-ই বা হতে পারে। কৈশোর থেকে যাত্রাগানে তার মন মজে গিয়েছিল। তখন থেকেই গাঁয়ের যাত্রায় পার্টটার্ট করত। তারপর দিনে দিনে এটা তার নেশা হয়ে দাঁড়াল। সাংঘাতিক নেশা। নিজের একটা দলই গড়ে ফেলল নীলকণ্ঠ—'কালী অপেরা।' এ কালী মা-কালী নয়, কালিপদ ঘাঁটি। টাকা দিয়েছিল প্রথমটায় যাত্রার দল গড়তে, তাই তার নামে নাম।

নীলকণ্ঠ দল গড়েছে, দল বজায় রেখেছে; কাছাকাছি শুধু নয়, দূর দূর গ্রামে পাল্লা দিয়ে সুনাম লুঠে নিয়ে এসেছে। পালাও লিখেছে নতুন নতুন। একটা পালা তো চিৎপুরের তরুণ অপেরা কিনে নিল। সেটার ছাপা বই পাওয়া যায় কলকাতায়। পাঁজিতে তার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়।

এ-হেন নীলকণ্ঠ আজ আর নতুন পালা লেখার বিষয় খুঁজে পাচ্ছে না। মনে মনে যাও বা একটা বাছে, কিছুক্ষণ পরেই সেটা মনে হয় পুরনো, অচল। খুঁতখুঁত করে মন। নীলকণ্ঠ বাতিল করে দেয়।

ফটিক আঘোরীর কাছ থেকে বায়না নেবার পর বিশটা দিন কেটে গেল, নীলকণ্ঠ কিছু ঠিক করতে পারল না, একটা লাইনও লিখতে পারল না।

ছটফট করছিল নীলকণ্ঠ। মনে মনে ভীষণ একটা অস্বস্তি আর অক্ষমতার রোষে পুড়ছিল। সময় তো আর বেশী নেই। পালা লিখতে হবে, মহড়া বসাতে হবে, দরকার হলে নাচের মাষ্টারকে দিয়ে ছোঁড়া-গুলোকে আরও নতুন নতুন নাচ শেখাতে হবে। নীলকণ্ঠ তার ঘরে সারাদিন বসে বসে কাশীরাম দাসের মহাভারতটার পাতা উল্টে যায়। মাঝে মাঝে কোনো একটা পাতায় চোখ রেখে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকে। তারপর বইটা বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, জানলা দিয়ে ঢেঁড়স আর কলাগাছের ঝোপটার দিকে চেয়ে থাকে।

চট্টরাজ সেদিন শুধল, 'কী হে, ভট্‌চার্যি লিখলে নাকি কিছু?'

'না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল নীলকণ্ঠ।

নীলকণ্ঠর মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে চন্দ্ররাজ বললে, 'হল কী তুমার, অ্যাঁ—!' একটু থেমে আবার বললে, 'পরিবারটা মরে তুমার মাথাটাই গণ্ডগোল হয়ে গেল যে হে! এটা ছাড়লে, সেটা ছাড়লে—পালা লেখাটাও ছাড়লে তুমি!'

নীলকণ্ঠ কোনো জবাব দিল না। অনেকক্ষণ বন্ধুর দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে থেকে শেষে অবশিষ্ট তাড়িটুকু একচুমুকে গলায় ঢেলে নিল।

পরের দিন নীলকণ্ঠ ভীষণ একটা গোঁ নিয়ে সকাল থেকেই নতুন একটা খাতা খুলে বসেছিল। সস্তা একটা কাঠের ডেক্স। শরের আর পালকের কলম। এক দোয়াত কালি। কাশীরাম দাসের মহাভারত আর কৃত্তিবাসের রামায়ণটা পাশে। এক বান্ডিল বিড়ি। দেশলাই।

সকালটা কেটে গেল। একটা অক্ষরও লিখতে পারল না নীলকণ্ঠ। দুপুরে স্নান-খাওয়া করে আবার বসল। নতুন এক বান্ডিল বিড়ি আব এক কৌটো পান নিয়ে। পানের সঙ্গে বিড়িব ধোঁয়া এমন একটা আচ্ছন্ন তন্দ্রা আনল যে, নীলকণ্ঠ ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকেল শেষ হতে চলেছে। ডোবার ও-পারেব ধুঁধুল-ঝোপে ফুরনো বিকেলের ম্লান একটু আলো। একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে। ধড়মড় করে উঠে বসে নীলকণ্ঠ ডেক্সের দিকে তাকাল। খেরোয় বাঁধানো খাতাটা তেমনি পড়ে আছে। রামায়ণ মহাভারতটাও পাশাপাশি সাজানো।

মুখেচোখে জল দেবার জন্যে খড়মটা পায়ে গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল নীলকণ্ঠ। পূর্বদিকের দাওয়ায় দড়ির খাটিয়াটায় ললিত বসে আছে। খুব অন্যমনস্ক। খেয়াল নেই কিছু। নয়ত নীলকণ্ঠব খড়মের শব্দে চোখ ফিরিয়ে তাকাত অন্তত একবার। বলাইটা এক বাটি মুড়ি নিয়ে সদরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনমনে ছড়া কাটছে।

নীলকণ্ঠর খড়মের শব্দ তুলে মুখ-হাত ধোবার জায়গাটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল। মুখ-চোখে জল দিতে গিয়ে যেন চোখে পড়ল হঠাৎ। তাকাল নীলকণ্ঠ। গোয়ালঘরের পাশটায় দোপাটি আর মোরগ ফুলের ঝোপটার কাছে কুসুম। এই অসময়ে কেন? মুখটা দেখা যাচ্ছিল না কুসুমের। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে শশাগাছের মাচাটা যেন ঠিক

করছে। অথচ ও-মাচা ঠিক করার কিছু নেই।

নীলকণ্ঠ উঠে পড়ল। ঘরের দিকে এগুতে গিয়ে একবার একটু দাঁড়িয়ে ললিতের দিকে তাকাল। না, এখন আর বেঘোরে নেই ছেলেটা। বাপের দিকেই তাকিয়ে আছে।

কী ভেবে নীলকণ্ঠ ছেলেকে কাছে ডাকল। সামনে এসে দাঁড়াল ললিত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলের মুখটা দেখল নীলকণ্ঠ। কেমন যেন বোকা-বোকা নিরীহ ভালমানুষ গোছের মুখ। গোলগাল। নীলকণ্ঠর হাসি পায়। পুরুত-বংশের উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর মুখই বটে। অর্থহীন, দুর্বোধ্য কতকগুলো মন্ত্র আউড়ে যেতে এর কোথাও বাধবে না। ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মতন একটু যেন রসিকতা করে বসল নীলকণ্ঠ, 'কী হে বাপ, আজ ঘণ্টা নাড়তে যাবে নাই কুথাও ?'

মাথা নাড়ল ললিত। হ্যাঁ, যাবে। লক্ষ্মীপুজো আছে সিংহীদের বাড়িতে।

ঠিক, ঠিক। আজ লক্ষ্মীবার। নীলকণ্ঠ ভুলেই গিয়েছিল।

'আর উটার কী হল? জমির আলটার? হারু গোমস্তার কাছে গিয়েছিলে নাকি ?'

ললিত এবার মাথা নাড়ল। গিয়েছিল গোমস্তার কাছে। মিট-মাট হয়ে গেছে সব।

'বেশ. বেশ।' ছেলেকে বাহবা দেবার মত করে শব্দটা উচ্চারণ করলে নীলকণ্ঠ। একটু থেমে বললে, 'রাতে একবার আমার কাছে এস হে, কথা আছে কটা।'

নীলকণ্ঠ আর দাঁড়াল না। খড়মের শব্দ তুলে নিজেব ঘরে চলে গেল।

ঘরে এসে আবার চুপচাপ। কটা বিড়ি পর পর শেষ করল নীলকণ্ঠ। খেরোয় বাঁধান খাতার সাদা পাতাগুলো অনর্থক উল্টে গেল। নামল তক্তপোশ থেকে। পায়চারি করল ক'বার। জানলায় এসে দাঁড়াল। ডোবার কালো জলের একপাশে একটা হাঁস এখনো খাবার খুঁটছে। ডাবগাছের লম্বা ছায়া ডোবা ডিঙিয়ে কোথায় যেন অন্ধকারে মিশে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল। শাঁখের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

নীলকণ্ঠ নিজের অস্থিরতা নিজেই বুঝতে পারছিল। মনের মধ্যে অনেককাল পরে সেই বিশ্রী চাঞ্চল্য আবার এসেছে। আবার সেই তুষের

জ্বলন। একটা কথা যেন ভয়ংকর অন্ধকার থেকে খানিকটা মুখ বার করে নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছে।

ছটফট করছিল নীলকণ্ঠ। কপালে একটু একটু ঘাম জমছিল। নিশ্বাস দ্রুত পড়ছিল মাঝে মাঝে।

সন্ধ্যা দিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে রোজকার মতন আজও লণ্ঠন রাখতে কুসুম ঘরে এল।

নীলকণ্ঠ বললে, 'একটু জল খাওয়াও তো।'

জল দিয়ে গেল কুসুম। নীলকণ্ঠ যে কী ভীষণ তৃষ্ণার্ত ছিল, জলের ঘটিটা শেষ করে তা যেন বুঝতে পারল।

লণ্ঠনটা ডেস্কের উপর চাপিয়ে হঠাৎ খেরোয়-বাঁধানো খাতাটা খুলে ফেলল নীলকণ্ঠ। সাদা পাতাগুলো যদিও সাদা—তেমনি নীরব ছিল, তবু নীলকণ্ঠ এখন যেন ওই সাদা পাতার মধ্যে অনেক অনেক কালো রেখা দেখতে পাচ্ছিল। অজস্র কথা।

চমকে উঠল নীলকণ্ঠ। হাতটা সরিয়ে নিল খাতা থেকে। ঘরের চারপাশে তাকাল। না, কেউ নেই। লণ্ঠনের শিষটা আরও খানিক বাড়িয়ে দিল।

নীলকণ্ঠ মনে মনে সত্যিই তবে নতুন একটা পালা তৈরি করে ফেলেছে, এতদিন চুপচাপ থাকে নি। অবশ্য পালাটা শেষ হয় নি, হয়ত অর্ধেকও নয়, তবু অনেকটাই হয়েছে।

নিজের মুখ নিজে দেখতে পাচ্ছিল না নীলকণ্ঠ। কিন্তু অনুভব করতে পারছিল, পঁয়তাল্লিশ বছরের কঠিন তামাটে মুখটা এখন আঁচে ঝলসে যাচ্ছে। নিশ্বাস তপ্ত। চোখের মধ্যে সাংঘাতিক একটা জ্বালা, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা। অসহ্য। নীলকণ্ঠ ঘামছিল দরদর করে।

সাড়াশব্দ নয়, কিন্তু নীলকণ্ঠ বুঝতে পারল। পাথরের গেলাসে চা নিয়ে কুসুম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দৃষ্টিটা স্বচ্ছ নয়, একটু ঘোলাটে, খানিকটা হয়ত বিকারের রোগীর মতন। লণ্ঠনের শিখাটা আচমকা শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে নীলকণ্ঠ কুসুমকে দেখতে লাগল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কুসুম। ভয় না, শুধু অবাক চোখেই সে তাকিয়ে ছিল। চায়ের গেলাসটা হাতে ধরেই।

লণ্ঠনের বাড়ান পলতেয় শিষ উঠে কাঁচটা কালো হয়ে এল। ঝাপসা

আর অন্ধকার দেখাচ্ছিল কুসুমের গোটা শরীরটাই। নীলকণ্ঠ চোখের দৃষ্টিকে হয়ত আরও তীক্ষ্ম, আরও উজ্জ্বল করবার চেষ্টা করল। পারল না। তার আগেই শিষের কালোয়-ক্বালোয় লণ্ঠনের সমস্ত কাঁচটা ভরে গেছে। চিড় খাওয়ার শব্দ করে কাঁচটা ফেটে গেল।

এতক্ষণে যেন নিজেকে ফিরে পেল নীলকণ্ঠ। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের শিষটা কমাতে গেল। বেকায়দায় হাত লেগে লণ্ঠন ডেক্স থেকে উল্টে তক্তপোশে পড়ল। নিভে গেল কয়েকটা লিকলিকে আঁকাবাঁকা ফণা তুলে।

অন্ধকার। কুসুমকে আর দেখা যাচ্ছিল না।

নতুন করে বাতি জ্বালিয়ে সত্যি সত্যি নীলকণ্ঠ এতদিন পরে আজ পালা লিখতে বসে গেল। কী সহজে এবং অক্লেশে এখন কথাগুলো আসছে। এতদিন কোথায় ছিল এই কথা, কোন্ অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল!

দু-চার ছত্র করে লেখে নীলকণ্ঠ আর থেমে গিয়ে আবেগ-কাঁপা গলায় জোরে জোরে পড়ে। যেন অভিনয় করছে। গলার পর্দা কোথাও চড়িয়ে, কোথাও আস্তে করে; কোথাও ব্যাকুলতা, কোথাও মিনতির সুর ফুটিয়ে পড়ে যায়।

খেয়াল ছিল না নীলকণ্ঠর, রাত হয়ে গেছে। ললিত এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে, বাবার মুখোমুখি। নীলকণ্ঠ তন্ময়। কিছু দেখে নি, কাউকে নয়। দীর্ঘ একটা অংশ লিখে মুখ তুলল। সেই তন্ময়তার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে পড়ে যেতে লাগল সদ্য-লেখা অংশটা।

নীলকণ্ঠর স্বরে অদ্ভুত এক বেদনা এবং বিষণ্ণতা আর ব্যাকুলতা। কী কাতর কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছিল না, এটা নাটকের অভিনয়। বুক থেকে প্রত্যেকটি কথা যেন স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসছিল। শাপ-গ্রস্ত জরাভীত, ভোগী এক পুরুষ কাতরকণ্ঠে যৌবন ভিক্ষা করছে। আমি সুখের অভিলাষী, আমি ভোগের ভিক্ষুক, আমি বিলাসে ক্লান্ত হই নি, আমার দেহ এই অকালে শ্লথচর্ম, লোল হয়ে যাবে—; না, না—এ আমি সহ্য করতে পারব না। এখনো যে আমার ভোগ্য ধেনু আছে, সুরা আছে, ফল আছে, পুষ্প আছে, নারী আছে, শত-সহস্র সুখ আছে এই বসুন্ধরায়। তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করো না। 'তৃপ্ত নহি, ক্লান্ত

নহি—; আসঙ্গ জ্বালায় জ্বলে এ-দেহ নিয়ত। প্রার্থনা আমার পুত্র পূর্ণ কর তুমি। আমি যে তোমার পিতা, নৃপতি যযাতি—!'

নীলকণ্ঠ নয়, রাজা যযাতি যেন পুত্র পুরুর কাছে করজোড়ে ভিক্ষুকের মতন অশ্রুসজল কণ্ঠে ভীষণ একটা আবেদন জানিয়ে কাতর প্রত্যাশী চোখে চেয়ে থাকল।

ললিত কথা বলতে পারছিল না। বিমূঢ় ভাবটা কাটাতে সময় লাগল তার। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় যযাতিকে সে চিনতে পারল সহজেই।

'বাবা—' ললিত আচমকা ডাকল।

চমকে উঠল নীলকণ্ঠ। ললিত সামনে দাঁড়িয়ে। একেবারে মুখের কাছটিতে। আর কেউ নেই। লণ্ঠনের একটু আলো—আর পিতা-পুত্র।

নীলকণ্ঠ যেন কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিল। পারছিল না।

ললিত খুব মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট গলায় বললে, 'মেয়েছেলে বাসায় না থাকায় বড় অসুবিধা ঘটছে। একটা বিয়া করুন আপনি। কুসুমকেই করুন। ভাল মেয়ে।'

ললিত আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নীলকণ্ঠ চুপ। ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে ললিতকে একবার ডাকে। ডাকতে পারছিল না। লণ্ঠনের শিখাটা যযাতির চোখের মতন জ্বলছে।

আঙুরলতা | জানোয়ার

জানোয়ার

এস বি সোম। লোকে বলে শুয়ারের বাচ্চা সোম। পুরো নামটা কিন্তু সুধীবন্ধু সোম। সোম নিজে এবং তার স্ত্রী অতসী ছাড়া এই নামটা আর কেউ জানে বলে মনে হয় না।

অথচ জানা উচিত ছিল। সোনাপুর অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনে চারটে বছর সোমের কেটে গেল। তার আগে ছিল পুলিসে। এফি-সিয়েন্সি যেভাবে দেখাচ্ছিল তাতে উন্নতি হচ্ছিল, ভবিষ্যতে আরও উন্নতি অবধারিত ছিল। কিন্তু সোমের ওই আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঁচুতে ওঠার ধৈর্য ছিল না। তা ছাড়া অল্প দিনেই যে রকম সুনাম করেছিল সোম তা সোনাপুর অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের খোদ কর্তাদের পর্যন্ত কানে গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে একটা ব্যবস্থা হল। সোম এল সোনাপুরে। প্রথম বছরটা অ্যাসিসটেন্ট; তার পরেই একে-বারে সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডবলু অ্যান্ড ডবলু—। ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের হর্তাকর্তা বিধাতা। বারোশোর গ্রেড। অফিসার্স বাংলো, ইলেকট্রিসিটি, মালি আর জমাদার ফ্রি। কোম্পানির গাড়ি আর পেট্রল। চল্লিশেই সোম এতোটা এগিয়ে এল। ভবিষ্যৎ তো পড়ে আছে সামনে। সোমের স্বপ্ন বারশোকে সে হাজার দুইয়ে অন্তত তুলবে। সোনাপুর অ্যালু-মিনিয়াম কর্পোরেশনের ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের সোয়াশো ওয়াচম্যান, তিরিশজন আর্মড্ গুর্খা আর জনাচারেক জুনিয়ার যে কোম্পানি ফালতু পুষছে না—এই কাজের কথাটা ডিরেক্টরস বোর্ডকে আরও একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

সোনাপুরে আসার পর থেকেই সোম অবশ্য সব সময় এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কথায় নয় কাজে। আর তার ফলেই সুধীবন্ধু সোম —এস বি সোম সোনাপুরের লোকের কাছে শুয়ারের বাচ্চা সোমে দাঁড়িয়েছে।

সোনাপুরের যারা লেবারারস্—মজুর, মিস্ত্রি, ফিটার, ফোরম্যান-টোরম্যান মায় কেরানী বাবুটাবু তাদের চোখ নেই। থাকলে সোমকে

অন্য নামেও ডাকতে পারত। সোমকে দেখতে সত্যিই আর শুয়ারের বাচ্চার মতন নয়। বরং উল্টো। বেশ সুপুরুষ চেহারা। তা ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা, পেটানো শরীর, গায়ের হাড়গুলো যেমন চওড়া তেমনি কঠিন, রঙ আধ-ফরসা, চুল সামান্যই কিন্তু লালচে রঙ-ধরা। ঘাড়ের বাঁক দুটো বেশ চেটালো, গলা ছোট অথচ পুরু। আর মুখ—মুখটাই বা মন্দ কি দেখতে, নাক লম্বা হলেও আগায় একটু চাপা, দেখলে মনে হয় ভেতরের হাড় ভাঙা। গালে খুব একটা মাংস নেই, ভারি চোয়াল; সুন্দর করে কামানো একটু গোঁফ। ছোট কপাল, মাঝে একটা শিরা ফুলে থাকে রক্তের চাপে নীলচে হয়ে। চোখ দুটো টানা-টানা হলেও কালো ভুরুর নীচে একটু ধূসর রঙের তীক্ষ্ন মণি দুটো সোমের ভীষণ ব্যক্তিত্বটা আরও ভীষণতর করে প্রকাশ করে। তা করুক। তা বলে এই চেহারা যার, তাকে শুয়ারের বাচ্চা বলা কেন?

সোনাপুর অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের বাবুটাবুদের জিজ্ঞেস করলে বলবে, চেহারার জন্যে কি বলি মশাই, বলি গুণের জন্যে। এমন খচ্চড় লোক আমাদের এখানে আর দুটি পাবেন না। বেশ ছিল পুলিসে—হারামজাদা কেন যে মরতে এখানে এল—! জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে সকলকে। তবে এখানে বেশিদিন করে খেতে হবে না। একদিন শালা ঠিক গায়েব হয়ে যাবে—নুনিয়ার জলে পুঁতে দিয়ে আসব।

আর মজুর-মিস্ত্রিদেব জিজ্ঞেস করলে তারা বলবে, উ শালা হারামি হ্যায়, পয়লা নম্বরকা হারামি। ডাঁট উতার যায়গা একরোজ। শালেকো ব্যাস—উঠা লেগা আউর বয়লারকো আন্দার ঘুসা দে গা।

সোমের এই দুর্নাম দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়ছিল। আগে যাও-বা সোমকে উল্লেখ করতে হলে কেউ কেউ বলত সোমসাহেব, ইদানীং তাও আর কেউ বলত না। শুয়ারের বাচ্চা নামটাই চালু হয়ে গিয়েছিল।

অফিসার্সদের মধ্যেও সোমের সুখ্যাতি ছিল না। মুখার্জি, রায়, সেন, কিংহাম, গ্রীসলে—সবাইকেই কোনো না কোনো ছোটখাটো ব্যাপারে একবার অন্তত বিব্রত এবং বিরক্ত না করেছে এমন নয়। একবার কারখানায় মুখার্জি সাহেবের জন্যে একটা চাটু তৈরি হয়ে বাংলোয় যাচ্ছিল—চাপরাসী নিয়ে যাচ্ছিল, ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের লোক তাকে ধরে সোজা সোমের কাছে এনে হাজির করলে। সোম তলব করলে মুখার্জি সাহেবকে। মুখার্জি সাহেব ইঞ্জিনিয়ার মানুষ—ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের

সোমের অফিসে তিনি যাবেন না। সোমও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত চিঠি। সোম ইংরিজীতে দু-লাইন খসখস করে লিখে পাঠিয়ে দিল—যার বাংলা অর্থ—কারখানা মিঃ মুখার্জির চাটু তৈরি করার জন্যে নয়।

মুখার্জি সাহেব সেই দিন থেকেই সোমের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা।

গ্রীসলের সঙ্গে একদিন তো খুনোখুনি হবার যোগাড় হয়েছিল। গ্রীসলের শালা এসেছিল ফ্যাক্টরীর মধ্যে দেখা করতে। মোটর বাইক চেপে। গেটে ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের শান্ত্রীরা আটকে দিল তাকে। পাস আছে? নেই? ভেতরে ঢোকা চলবে না। গ্রীসলের শালা চটেমটে ফিরে গেল। কথাটা সন্ধ্যেবেলায় জানতে পারল গ্রীসলে। পরের দিন সকালেই সোমের অফিসে গ্রীসলের পদার্পণ। গ্রীসলের তিনপুরুষ আগেকার স্কচ্ রক্ত ফুটছিল। সোমের দাঁতগুলো খসিয়ে দেয় আর কি! 'আমার লোককে গেটে আটকে দেওয়ার মানে আমাকে অপমান করা। তোমার এ-অধিকার নেই।'

'তোমার শালার জন্যে কি ফ্যাক্টরীর আলাদা নিয়ম?' সোম নিজের চেয়ারে বসে বসে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে।

'এ-সব বাজে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি তো তুমি করেছো—আগে ছিল না।' গ্রীসলে ঝাঁঝালো স্বরে জবাব।

'ইয়েস আমি করেছি। বছরে বিশ পঁচিশ হাজার টাকার কোম্পানির মাল তোমরা চুরি করছিলে। বাইরের লোক ঢুকে দুবার স্ট্রাইক করিয়েছে কারখানায়।'

গ্রীসলে লাফিয়ে পড়ে সোমের কলার চেপে ধরল, 'আমি চোর, আমরা থিভ্‌স্? য়ু রাস্কেল—! আমার লোক আন্‌ডিজায়েরবল্ এলিমেন্ট!'

সোম গ্রীসলের হাত পলকে সরিয়ে দিল। চোখ দুটো তার আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতন জ্বলছে। 'আর একটা কথা বলেছো কি তোমার প্যান্ট শার্ট খুলে নিয়ে চাবকাবো। বাগার কোথাকার!'

ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের সেপাই শান্ত্রী না থাকলে সেদিন সোম-গ্রীসলের দ্বন্দ্বটা কোথায় যে গড়াত কে জানে।

গ্রীসলে সেইদিন থেকে সোমের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে রয়েছে। সোমকে পথে দেখলে মনে-মনে সপ্তপুরুষ উদ্ধার করে—নাম শুনলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। রায়, সেন, ভাদুড়ী—সকলেই তাই। এঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন, সোম একটা স্কাউন্ড্রেল। টু মাচ্

আনপপুলার। এমন আর কেউ নয়। ও লাইফ রিস্ক্ নিচ্ছে। কেলেঙ্কারী একদিন একটা হবেই। এই তো সেদিন স্টোর শেডের কুলিরা ঘিরে ধরেছিল। ওদের হাতেই মরবে একদিন।

কথাটা মিথ্যে নয়। সোম নিজেও বুঝতে পেরেছিল, তার নাম সুধীবন্ধু হলেও আসলে সে সুধীজনের বন্ধু মোটেই নয়। বরং ঠিক উল্টো, সোনাপুর অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশনের সবায়ের সে শত্রু। সবাই তার শত্রু। ডিরেক্টারস বোর্ডের দু একজন যা একটু সুনজরে দেখে তাকে। সোম বোকা নয়, মূর্খ নয়; জীবনের ওপর মমতা যে নেই তাও নয়—আবার সহজে ভয় পাবার ছেলেও সে নয়। ভয় করলেই পিছিয়ে পড়তে হবে। বারোশো দেড় হাজারের গ্রেড কোনো দিন দু হাজারে ঠেলে তোলা যাবে না। কাজেই নির্ভয় তাকে থাকতেই হবে—তবে প্রাণটাও বাঁচাতে হবে। আর সাবধানে সতর্ক হয়ে থাকলে প্রাণ সহজে যাবে না।

ভেবে-চিন্তে এবং খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সোম ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড থেকে বাহাদুরকে নিজের জন্যে নিয়ে নিল। কারখানার মধ্যে কিংবা খাস অফিসে পার্সোনাল গার্ডের দরকার ছিল না সোমের। নিরাপত্তার অভাব ঘটবে না সেখানে। তা ছাড়া কারখানার মধ্যে অতোটা সাহস কারুর হবে না, দুশ্চিন্তা বাংলো নিয়ে। বাংলোটা অফিসার্স বাংলোর একেবারে শেষে—নুনিয়া নদীর কাছে। চারপাশ ফাঁকা। ঝোপঝাড় গাছপালায় ভর্তি। কাছাকাছি মানুষ বলতে ওখানে ভাদুড়ী সাহেবের বাংলো—তাও অন্তত পঞ্চাশ গজের বাইরে। আপদবিপদে ডাকলে সাড়া পাওয়া যাবে না। অবশ্য সোমের দৃঢ় ধারণা, ডাক শুনতে পেলেও ভাদুড়ী সাড়া দেবে না। ইচ্ছে করেই।

তা বলে সোম কি এই ভয়ের কৈফিয়ৎ দিয়ে বাংলো বদলাতে চাইবে? কখনোই না। সোম সাহেব ভয় পেয়েছে—এ-কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করলে সোমের সিংহাসনে ফাটল ধরে যাবে।

সোম বাংলো বদলাতে চাইল না। শুধু একবার দেখা করলে জি এম-এর সঙ্গে। 'আমার বাংলোয় একটা গার্ড রাখতে চাই। ফর সেফটি।'

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর। 'সিওর, অনেক আগেই গার্ড রাখা তোমার উচিত ছিল সোম। কেন রাখো নি? ইয়োরস ইজ্ এ রিস্কি জব।'

বাহাদুরকে পরের দিন থেকেই নিজের বাংলোয় রেখে দিল সোম। পার্সোনাল গার্ড।

সোমের তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে বাছাই হয়েছে বাহাদুর। বোঝাই যায় মানুষটা ভয়ংকর হবে। এমন মানুষ যার ওপর সোম অনায়াসে আস্থা রাখতে পারে; হ্যাঁ—সেই নির্জন নুনিয়া নদীর বাংলোয় শীত কি বর্ষা কিংবা গ্রীষ্ম অথবা হেমন্তের ছমছমে রাত্রিতেও যার ওপর আস্থা রেখে, ভরসা করে সোম ঘুমুতে পারে।

সোমের নির্বাচন নিখুঁত। বাহাদুর তেমনি মানুষ যাকে দেখলে ভয়ংকরই মনে হয়। তার শরীরের মধ্যে একটা ভয় যেন জমে রয়েছে। মানুষটাকে চোখ দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে না। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রুচি হয় না। কুচকুচে কালো রং। মাথার চুল ছোট ছোট, কোঁকড়ানো। মুখটা গোল। নাক ছোট আর বসা। চোয়ালের হাড় উঁচু উঁচু। চোখ দুটো ছোট ছোট। ভুরু যেন নেই। দৃষ্টিটা ওপর ওপর বোকাটে—কিন্তু একটু নজর করলেই মনে হয় বোকামির নীচে ভীষণ হিংস্র আর বেপরোয়া একটা পশুর চোখ লুকিয়ে আছে। বেঁটে কোঁদানো চেহারা। ঘাড়ে পিঠে স্ফীতকায় মাংসপেশী। পায়ে হাতের গুলীতে লোকটার শক্তি যেন চমকে উঠছে।

নাম বাহাদুর হলেও লোকটা নেপালী নয়। সোমের ধারণা, মা-বাপের কেউ একজন নেপালী ছিল ; অন্যজন এ-পাশের কোনো ডোম, মেথর কি সাঁওতালটাঁওতাল হবে। গলায় তাই বুঝি একটা তাবিজ ঝোলে কালো সুতোয় বাঁধা। সে যাক—ব্রিডিংটা জুতসই হয়েছে। শক্তির বাধ্যতা, ভয়ের সঙ্গে ভয়ংকরতা মিশ খেয়েছে।

সোমের বাংলোয় বাহাদুর অদ্ভুত মিশ খেয়ে গেল। মেহেদী আর কাঁটা তারের ফেন্সিংয়ের আড়ালে হাফ প্যান্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি গায় একটা ভয়ংকর পশু যেন সকাল থেকে রাত—সারারাত সোমের বাড়ি আগলে রাখছে। না ভুল হল—পশু নয়—পশুপালক—কেন না সোম শুধু বাহাদুরকে রেখেই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারে নি—দুটো সাংঘাতিক কুকুর পর্যন্ত আমদানি করে ফেলল। একটু বাড়ন্ত ছানাই এনেছিল—বিশুদ্ধ বিলিতী রক্তের—ছ' মাসেই তারা গায়ে গতরে ভীতি-প্রদ হয়ে উঠল। আর বাহাদুর সেই দুটো অ্যালসেশিয়ানের গলায় বাঁধা শক্ত চামড়ার বক্‌লস দু হাতে ধরে সোমের বাংলোর কম্পাউন্ড আর গেট

আটকে দাঁড়িয়ে গেল। দৃশ্যটা ভয়ংকর, ভীতিকর। চোখে পড়লে বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। মনে হয় একটা শয়তান তার অনুগত দুই দুর্ধর্ষ অনুচরের ঝুঁটি ধরে এই বাংলোটার একাকীত্ব রক্ষা করছে: কারও সাধ্য নেই গেট খুলে একটা পা বাড়াবে। একটা ডাক পর্যন্ত দিতে ভয় হয়, শিসের একটু শব্দ পর্যন্ত কানে গিয়েছে কি বাংলোর ভেতর থেকে মূর্তিমান দুই যমদূতের গর্জন ভেসে উঠবে।

সোম হুকুম করে দিয়েছিল, 'বাহাদুর, ওহি দোনোকো রোজ গোস খিলানা। হল্দি আর থোড়া চাউল ডাল্না গোসমে।'

'জী, হুজুর!'

'ডগ্ সোপ্-সে দু দিন বাদ নাহা দেনা।'

'জী, হুজুর।'

'দেখো, ওহি দোনোকো শিকারী বানাও। বল্ খেলাও, আউর চিড়িয়া মারকে তফাৎমে ফেঁকো। সামঝা?'

'জী, হুজুর।'

সোম যা যা বলেছিল বাহাদুর নিখুঁতভাবে সব করেছে—করছে এখনও। নিজের হাতে সামান্য হলুদ আর নুন দিয়ে অল্প চালের সঙ্গে মাংসর হাড় সেদ্ধ করে কুকুরদের খাওয়ায় রোজ। দু দিন অন্তর ডগ সোপ দিয়ে চান করিয়ে দেয়। শিকারী করে তোলার জন্যে বল্ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত দূরে, শিকার ধরা শেখাত। আজকাল প্রায়ই শিশু কী নিমগাছে সকাল-বিকেল চড়ুই শালিক কাক এসে বসলে ছররা দিয়ে বন্দুক ছোঁড়ে বাহাদুর,—পাখিগুলো টুপটাপ মাটিতে পড়লে কুকুর দুটো হাওয়ার বেগে ছুটে গিয়ে দাঁতে বিঁধে নিয়ে আসে। না, বাহাদুর এই শিকার কুকুরদের খেতে দেয় না। সাহেবের নিষেধ, তাতে কুকুরের রক্ত খারাপ হয়ে যাবে।

কুকুর দুটোকে পাকা শিকারী তৈরি করতে করতে বাহাদুর একদিন থামল। গাছতলা থেকে মরা পাখি কুড়িয়ে আনার খেলা বাহাদুরের আর পছন্দ হচ্ছিল না, কুকুর দুটোরও বোধ হয় ভাল লাগছিল না।

সেদিন সোম যখন পিছন দিকের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে, বেতের টেবিলটার একদিকে সোম—আর একদিকে অতসী, চায়ের ট্রের ওপর পরিপাটি করে বিছানো নক্শা তোলা কাপড়টার ওপর একটা টকটকে লাল সুতোর প্রজাপতি নিশ্চল হয়ে আছে, বাহাদুর সামনের বাগান

থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এল। বারান্দার নীচে প্রথম সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল।

'কিয়া বাত বাহাদুর?' সোম বেতের টেবিলে খবরের কাগজটা রেখে দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল।

'হুজুর!' একটু থামল বাহাদুর, মুখ তুলল, অতসীকে দেখল এক পলক, চোখ ফিরিয়ে সোমের দিকে চাইল, 'দুসরা কোই গেম্ শিখলানে হোগা।' বুড়ো আঙুলের তলা দিয়ে গলায় ঝোলানো তাবিজের সুতোটা ঘষে নিল বাহাদুর।

সোম বাহাদুরের মুখের দিকে অল্প একটু চেয়ে থাকল। যেন বাহাদুরের কথাটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। পরক্ষণেই বুঝে ফেলল। কুকুর দুটোকে অন্য কোনো শিকারের খেলা শেখাতে চায় বাহাদুর। মনে মনে খুশী হল সোম। বললে, 'ঠিক হ্যায়, শিখলাও।'

'জী হুজুর।' বাহাদুর মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছিল।

সোম ডাকল। বললে, 'মাগর দেখো বাহাদুর—বাহার মাত ছোড় দো। আউর হারবাখাত আপনা হাত-মে রাখনা,—কন্ট্রোল মে। সামঝা?'

'জী, হুজুর।' বাহাদুর সম্মতি জানাতে গিয়ে আর একবার চোখ তুলল। মেম সাহেব তার দিকে চেয়ে রয়েছে। একটুক্ষণ, তারপরেই বাহাদুর বাগানের ঘাস মাড়িয়ে তার কোয়ার্টারে চলে গেল। সারভেন্টস কোয়ার্টার। সামনেই।

অতসী বাহাদুরের দিকে খানিক চেয়ে থেকে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে সোমের দিকে চাইল। ভীষণ একটা বিরক্তি আর বিস্বাদ তার মুখে কালো হয়ে নেমেছে।

'তোমরা শুরু করলে কি?' অতসীর গলায় খুব ঝাঁঝ।

সোম সিগারেটটা ফেলে দিয়ে স্ত্রীর দিকে চাইল। কোনো কথা বললে না।

অতসী অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'ক্রমেই তোমরা এমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছ আমায় আর থাকতে দেবে না।'

'কেন, কি হল?' সোম খুব হাল্কা গলায় যেন স্ত্রীর সঙ্গে পরিহাস করলে।

চেয়ার ঠেলে অতসী একটু পিছিয়ে গেল। হয়ত রাগে, বিতৃষ্ণায়।

বললে, 'এ-বাড়িটায় মানুষ থাকে না পশু থাকে সেটা আমি বুঝতে পারি না। কি শুরু করেছো তোমরা?'

সোম একটু হাসল, 'মানুষের চেয়ে পশুরা ভাল সার্ভিস দেয়। কিন্তু বাড়াবাড়িটা তুমি দেখলে কোথায়—কুকুর দুটো সারাদিন বসে বসে খেলে আর ঘুমুলে ওয়ার্থলেস হয়ে যাবে। বাহাদুর ওদের তাজা রাখতে চায়।'

অতসী কোনো কথা বললে না। অসহ্য রাগ আর ঘৃণায় তার সারাটা মুখ বিশ্রী হয়ে গেছে।

সোম কি ভেবে, খুব খুশী খুশী মুখে, তারিফ করা গলায় বললে, 'যাই বলো তুমি, বাহাদুর যখন দু হাতে দুটো কুকুরের বক্‌লস টেনে দাঁড়িয়ে থাকে বেশ দেখায়। ফেরোসাস। কাছে এগুবার সাহস হয় না।'

অতসী চেয়ার ছেড়ে আচমকা উঠে পড়ল। হঠাৎ বললে, 'তা এবার তোমাদের কোন্ খেলা শুরু হবে।'

'আমি জানি না। বাহাদুর নিশ্চয় কিছু একটা মতলব ঠাওরেছে।' সোম কথা বলতে বলতে এবার কি ভেবে যেন বেশ জোরেই হেসে উঠল, 'জানোয়ারটার কথা শুনলে—মগজ পরিষ্কার হচ্ছে বোধ হয়,—বলে গেম্—!'

অতসী স্বামীর মুখের হাসি নির্বিষ্ট চোখে দেখতে দেখতে নিজেও একটু হাসল ঠোঁটের গোড়ায়, 'জানোয়ারের মতলব মতন খেলা—সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু হবে বোধ হয়।'

'না, না—সাঙ্ঘাতিক আর কি হবে! দেখলে না, আমি তো বারণই করে দিলাম—সবসময় নিজের কন্‌ট্রোলে—হাতের মুঠোয় কুকুর দুটোকে রাখতে বলে দিলাম। আফটার অল পশু তো! কখন কি করে বসবে—'

'বসতে পারে—বলা যায় না।' অতসী যেন সোমের বাকি কথাটা শেষ করে ছেদ টেনে দিল। আর দাঁড়াল না। বারান্দা থেকে সোজা ঘরে চলে গেল।

সোম আর একটা সিগারেট ধরাল।

অতসীর কাছে সত্যিই এ-বাড়ি অসহ্য—অসহ্য। আর ভাল লাগে না। ভাল লাগার মতন কিছু নেই। অতসী ভেবে পায় না, এতো মানুষ থাকতে সোমের সঙ্গে তার বিয়ে হল কেন! তার বাবা এমন

কিছু গরীব ছিলেন না, নিজেও সে দেখতে তেমন কিছু খারাপ নয়—তবু সোমের সঙ্গে বিয়ে হবার কি দরকার ছিল।

সোম যখন সোনাপুরে সবে এসেছে—তখনই তার বিয়ে হল। বাবা বুদ্ধিমান মানুষ। সোমের ভবিষ্যৎ যেন তাঁর দেখা ছিল। দেড় দু হাজারী জামাই যে মেয়ের কপালে সুখ-সৌভাগ্যের ছাতা ধরে থাকবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। অতসীরও সন্দেহ করার কারণ থাকে নি।

বিয়ের পর অতসী বুঝতে পারল একটা ভুল কোথাও হয়ে গেছে। সোম তেমন মানুষ যার কাছে দাম্পত্য জীবন কি স্ত্রী কিংবা সংসার বিশেষ একটা আকর্ষণ নয়। সকালের চা, দুপুরের ভাত, রাত্রের ঘুমের মতন স্ত্রী, সংসার সবই একটা স্বাভাবিক অভ্যাস। তার বেশি কিছু নয়।

আস্তে আস্তে অতসী সেটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করল। পারল না। বাড়িতে মন বসত না বলে প্রথম প্রথম অতসী চেষ্টা করলে বাইরের পাঁচজনের সঙ্গে মেশবার। মুখার্জি, রায়, সেন সাহেবদের স্ত্রী, কন্যা, ভাইঝিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, যাতায়াত, বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করলে—। কিন্তু কি আশ্চর্য, বাইরের পাঁচটি মেয়েও তার কাছে ধরা দিল না। প্রথম প্রথম মুখার্জি সাহেবের স্ত্রী কিংবা রায় সাহেবের বোনের সঙ্গে গল্প গুজব করতে গেলে তাঁরা ড্রয়িং রুমে এনে বসাতেন, নিজেরাও বসতেন। অল্প সল্প কথা বলতেন। চা দিতেন খেতে। ধীরে ধীরে সে-সব বন্ধ হয়ে গেল। বাংলোয় গেলে কেউ বলত, ও আপনি! আসুন, বসুন। আমার শরীরটা বড় খারাপ। ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছি। এখুনি এসে পড়বেন। কেউ বলত, এমন অসময়ে এলেন মিসেস সোম, আমাদের এখুনি গাড়ি নিয়ে বেরুতে হবে স্টেশনে—কলকাতা থেকে বড়দি আসছেন। একদিন মিসেস ভাদুড়ী তো অতসীকে বারান্দায় বসিয়ে রেখে বাথরুমে ঢুকে গেলেন মাথা ঘোরা আর গা গুলোনোর ছুতো দেখিয়ে তারপর ঠায় একটি ঘণ্টা কেউ আর সে-পথ মাড়াল না।

প্রথম প্রথম যাও বা একটু চক্ষুলজ্জা, সামাজিকতার বোধ ছিল আস্তে আস্তে তাও ঘুচল। অতসীকে কেউ আর বসতে, চা খেতেও বলে না। বরং তাকে দেখলেই ওরা অস্বস্তি বোধ করে, আতঙ্ক পায়

যেন। হ্যাঁ—অতসী বুঝতে পারল, তাকে সবাই এড়িয়ে যেতে চায়, দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তাকে অপছন্দ করে ঘৃণা করে।

সোমকে বললে অতসী; এতটুকু দ্বিধা না করে, 'তোমার এমন সুনাম এখানে যে আমাকেও মিসেস মুখার্জিরা হয়ত তোমার স্পাই কিংবা ইনফরমার ভাবেন।'

সোম শিস দিয়ে দিয়ে গালে সাবান ঘষছিল। বললে, 'ওই হাম-বাগটাকে একদিন শায়েস্তা করব। পাকা চোর একটা।'

অতসীর সারা গা ঘেন্নায় রি রি করে উঠল, 'তোমার কি লজ্জা ভদ্রতা কিচ্ছু নেই? মিঃ মুখার্জি বয়স্ক লোক, মানী মানুষ।'

'রাস্কেল!' সোম শিসের সুর থামিয়ে তার মত ব্যক্ত করলে।

অতসী স্তম্ভিত। একটু চুপ করে থেকে তেতো রুক্ষ গলায় বললে, 'তোমার জন্যে আমি কারুর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি না, মিশতে পর্যন্ত না। সকলে আমায় দূর দূর করে।'

'করে নাকি?' সোম রেজার তুলে গালের কাছে ধরল। 'কেন যাও ওদের সঙ্গে কথা বলতে?'

'যাব না তো করব কি! আমি মানুষ না পশু! লোকজনের সঙ্গে মিশব না, কথা বলব না—শুধু তোমার এই ভূতের মতন বাড়িতে সারা দিন-রাত একলা মুখ বুজে থাকব!'

সোম হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামতে বলল, 'তুমি যে ক্ষেপে গেছ দেখছি। কতকগুলো মেয়েলি গল্প না করলে তোমার কি খিদে হচ্ছে না নাকি? কে বলেছে তোমায় চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকতে! রেডিও বাজাও, রেকর্ড শোনো, ছুঁচের কাজটাজ করো, নাচো গান গাও, নভেল পড়ো। ডু অ্যাজ ইউ লাইক। সময় কাটানোর অভাব কি? বাগান রয়েছে, বাহাদুর রয়েছে।'

'বাহাদুর!' অতসীর গলার কাছে সাঙ্ঘাতিক একটা চমক এসে বিঁধে গেল।

'হ্যাঁ, বাহাদুরের কাছে বন্দুক ছোঁড়া শেখ না কেন? ও তোমায় শুটিং শেখাতে পারে!'

অতসী চুপ। মুখটায় যেন অনেকখানি রক্ত এসে জমে নীল হয়ে গেছে। চোখের মণি দুটো পাথর। গলার বাতাস-নলীর কাছে একটা বাতাসের কাঁকর যেন থর থর করে কাঁপছে।

সত্যিই সোমকে ঘৃণা করতে লাগল অতসী। বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ বাড়তে বাড়তে চরমে উঠল। সোমকে আর সহ্য হয় না। তার কাছে পর্যন্ত যেতে অতসীর আজকাল অদ্ভুত একটা ঘৃণা হয়। সোম মানুষ নয়—স্বামী তো কিছুতেই নয়—পশু, পশুর চেয়েও অধম একটা জীব। যদি অতসীর সাধ্য থাকত এই লোকটাকে সে বুঝিয়ে দিত সারা সোনাপুর শুধু নয়—তার ঘরের স্ত্রী পর্যন্ত তাকে অত্যন্ত জঘন্য একটা মানুষ বলে ভাবে—ঘৃণা করে—ভীষণ ঘৃণা। কিন্তু মজা এই, সোম এমন মানুষ যে ঘৃণা বোঝে না। বোঝে না তার স্ত্রী তাকে কতোটা ইতর, কুৎসিত ভাবে, কী পরিমাণ ঘৃণা করে। কিংবা বুঝলেও সেটা সে গ্রাহ্যই করে না। যেন স্ত্রীর ভালবাসা আর ঘৃণা দুইই সমান—কিছুতেই কিছু আসে যায় না সোমের।

আশ্চর্য, অতসীর দিন দিন এই ইচ্ছেটাই তীব্র হতে লাগল যে, সোমকে—তার স্বামীকে, সে সত্যিই যে সাঙ্ঘাতিক ঘৃণা করে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে, যেমন করেই হোক। যেন সেটা বোঝানোর ওপর অতসীর অস্তিত্ব, অতসীর স্বাতন্ত্র্য, তার নারীত্ব নির্ভর করছে। কিন্তু কি করে এই অমানুষিক ঘৃণাটা বোঝায় অতসী—!

বাহাদুর নতুন খেলা শেখাতে শুরু করেছে অ্যালসেশিয়ান দুটোকে। শিকার ধরার খেলা। সোমের নুনিয়া নদীর বাংলোয় দুটো পশুর পাশবিকতা ভীষণ হয়ে উঠেছে। বাহাদুর তার কোয়ার্টারের একটা ঘরে খরগোশ পুষছে। ধবধবে রঙ, লোমশ, চঞ্চল ক'টা জীব। সামনের মাঠে কাঠ-তক্তা জালি নেটের বেড়া দিয়ে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ধাঁধা করেছে। তার মধ্যে খরগোশ ছেড়ে দেয়। আর অ্যালসেশিয়ান দুটোকে খরগোশ ছোটে—অ্যালসেশিয়ান দুটো ধাওয়া করে। সারা বাংলোটা কুকুরের ভয়ানক, ক্রুদ্ধ ডাকে চমকে চমকে ওঠে।

অতসী একদিন এই নতুন খেলা পা বাড়িয়ে দেখত এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। পরে সোমকে বললে, 'তোমার বাহাদুরের নতুন খেলাটা দেখেছো?'

'হ্যাঁ, খুব বুদ্ধি খেলিয়েছে জানোয়ারটা। এত বুদ্ধি ওর মগজে এল কি করে?'

'আমি সামান্য যুগিয়েছি।'

'তাই তো বলি। এ কিন্তু দিব্যি হয়েছে। একটা খরগোশ নাকি

কাল মরেছে।’

‘নাকি! তা মরতে পারে, আশ্চর্য কি! মুখের খাবার রোজ রোজ ফস্কে যেতে কেউ দেয় না!’ অতসী পাশ থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

হ্যাঁ, বাহাদুরের নতুন খেলায় নরম খরগোশ মরেছে। প্রথমে একটা। তারপর দুটো। শেষে তিনটে খরগোশও গেল। *

এই খেলা শুরু হয়েছিল এক শীতের সকালে। মিঠে রোদে। হিমভেজা ঘাসে। দেখতে দেখতে শীত পেরিয়ে বসন্ত এল। নুনিয়া নদীর বাঙলোর আশেপাশের পলাশ-ঝোপ লাল হয়ে গেল—আগুন ধরল। টকটকে আগুন। অতসী যেন তার আঁচ গায়ে মেখে নিল।

‘বাহাদুর!’

‘জী মেমসাব!’

‘বাহার চলো।’

‘নুনিয়া মেমসাব?’

‘হ্যাঁ।’

‘কুত্তা?’

‘লে লেও!’

‘গান্—?’

‘জরুর।’

নুনিয়ার উঁচু-নীচু চরে—আগুন ধরা পলাশ বনে একটা পারপেল-রেড সিফনের শাড়ি ছুটে বেড়ায় পাগল হয়ে। যেন অদ্ভুত এক আগুনের শিখা ছুটে বেড়াচ্ছে। পাথর থেকে পাথরে, বালিতে, জলে—পলাশ আর কাঁটা ঝোপে ঝোপে। ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়ায়। দূরে কটা হাঁস নেমেছে, ঝোপের মাথায় বুঝি এক ঝাঁক পাখি বসেছে—অতসী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

‘বাহাদুর!’

‘জী মেমসাব।’

‘গান্ দেও।’

বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে ছর্‌রা ভর্তি বন্দুকটা এগিয়ে দেয়। অতসীর হাত আর চোখ এতোদিনে ঠিক হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ নুনিয়ার বুকে একটা শব্দ অট্টহাসি হেসে ওঠে। বাহাদুর কুকুর দুটো ছেড়ে দেয়।

বিশ্রী একটা ডাক।বাতাসে ছুঁড়ে কুকুর দুটো মরা পাখি কুড়িয়ে আনতে ছুটে যায়।

পলাশের আগুন লাগা বনে পারপেলরেড সিফনের শাড়ি দুলে দুলে হাসতে থাকে। সে তৈরি হয়ে উঠেছে। ওয়াণ্ডারফুল। সোম শুনলে নিশ্চয় বলবে, ওয়াণ্ডারফুল।

বসন্ত বুঝি আরও উগ্র, আরও তীব্র হল। ক'দিন থেকেই হাওয়া বইছে কেমন এক হাওয়া যেন। অতসীর ভেতর একটা চাপা আগুন এবার সব কিছু চৌচির করে তার মধ্য থেকে জ্বলে উঠেছে। নুনিয়ার চরে হঠাৎ একদিন বালির মধ্যে শুয়ে পড়ল অতসী। একটা অন্ধকার পা পা করে এগিয়ে আসছে। বালির মধ্যে লুটোপুটি খেতে গিয়েও হঠাৎ শান্ত, স্থির হয়ে গেল অতসী।

'বাহাদুর!'

'জী মেমসাব।'

'কুত্তা হাটাও।'

'জী।'

'ছোড় দেও দোনোকো।'

হ্যাঁ, বাহাদুর কুকুর দুটোকে ছেড়ে দিল। দুই পশুকে।

বসন্তও শেষ হল। গ্রীষ্ম এবং বর্ষা।

বৃষ্টি নেমেছে সোমের বাংলোয়। অ্যালসেশিয়ান দুটোর খেলা থেমেছে। বাহাদুরের কোয়ার্টারের সামনে বাঁধা থাকে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।

অতসী বিছানায়। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

'বাহাদুর।'

'জী মেমসাব।'

'গরম পানি বানাও।'

'জী।'

অতসী ফুটবাথ নেয়। বাহাদুর দুটি সুন্দর সুডৌল পায়ের কাছে বোবা পশুর মতন বসে থাকে। নধর হাঁটুর আবছা হাড় থেকে পায়ের গোড়ালি আর আঙ্গুল পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যেন দেখে। আর থেকে থেকে গলায় ঝুলনো তাবিজের সুতোয় বুড়ো আঙ্গুল ঘষে জোরে জোরে।

'বাহাদুর।'

'মেমসাব।'

'তোমারা দেশ কাঁহা?'

'মালুম নেহি।'

অতসী আচমকা খিল খিল করে হেসে ওঠে। বাহাদুর সেই হাসির ফোয়ারার দিকে অপলকে চেয়ে থাকে। অতসী বলে, 'তোমারা দেশ জঙ্গলমে। তোমারা আর তোমারা সাহাবকা। মালুম—'

'জী, মেমসাব।' বাহাদুর হাসে না। যেন কথাটা সত্যি। তার অস্বীকার করার কিছু নেই।

বর্ষাও ফুরিয়ে গেল। তারপর শরতের এক দুপুর কাটতে না কাটতে হঠাৎ ভীষণ বর্ষা নামল। সোমের বাংলোর গাছপালায় ঝড় তুলে, পাতা উড়িয়ে, ডাল ভেঙে ঝড় আর বৃষ্টি। দুরন্ত সে জলধারা। আকাশ কালো—নিকষ কালো। বাতাসে সে কালো যেন মিশে মিশে গেছে। বিকেলের মাঝামাঝি যেন রাত নেমে এল। বৃষ্টিও ঝরে চলেছে। অবিশ্রান্ত।

সোমের বাঙলোয় বাতি জ্বলে উঠল। সব বাতি নয়। একটি দুটি। অন্ধকারে আর জলের মধ্যে গাছপালা ঘেরা বাঙলোটা যেন সেই অল্প ক'টি মৃদু আলো নিয়ে নির্জন দ্বীপের মত পড়ে থাকল।

সন্ধ্যের একটু পরেই সোম ফিরল। গেটের কাছে আসতেই দাঁড়াল। গেট বন্ধ। গেটের বাতিটাও জ্বলছে না। হর্ন দিল সোম। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে দুটো বিকট হুঙ্কার অন্ধকার থেকে তীরের মত তার সামনে লাফিয়ে পড়ল। কুকুর দুটো গেট টপকে এলো বলে। তাড়াতাড়ি সোম গাড়ির কাঁচ দুটো তুলে দিল। ডিমার নিভিয়ে হেডলাইট জেবলে দিল গাড়ির। গেটের মাথার ওপর গলা তুলে ভয়ংকর দুই পশু পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। রোখা মূর্তি। চোখ জ্বলছে। ভীতিকর গর্জনটার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে আর একটা গর্জন লাফিয়ে উঠছে। সোম এই যেন প্রথম দেখল, কুকুর দুটো অত্যন্ত বীভৎস। যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে গলার টুঁটি ছিঁড়ে খেতে পারে। হাউ ফেরোসাস!

অধৈর্য হয়ে সোম আর একবার হর্ন দিল। না, বাহাদুর আসছে না। বৃষ্টির শব্দে কি জানোয়ারটার কানে তালা ধরে গেল, না ঘুম দিচ্ছে! রাস্কেল, ইডিয়েট কোথাকার। এই লোকটা তার গার্ড! এর

হাতে সোম তার সেফটি তুলে দিয়েছে।

ক্ষেপে গিয়ে সোম ইলেকট্রিক হর্নটা আর থামাল না। বরং হাতের সবটুকু জোর দিয়ে টিপে থাকল। বিশ্রী কর্কশ একটা একঘেয়ে শব্দ উপচে বাজতে লাগল।

হঠাৎ একটা শব্দ। জলের মধ্যে দিয়ে কেউ যেন ছুটে আসছে। বাহাদুর। দৌড়তে দৌড়তে এসে বাহাদুর কুকুর দুটোকে বাগিয়ে ধরে নিল। হেড লাইটের আলোয় সেই তিন জানোয়ারের মূর্তি গেটের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

গেটটা খুলে দিল বাহাদুর। গাড়ির মুখ গেটের মধ্যে বাড়িয়ে একবার ব্রেক কষল সোম। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল শয়তানটাকে। ধমকে উঠল, 'কিয়া করতা থা তুম! উল্লু কাঁহাকার। কুত্তা ছোড় দিয়া কাহে বাস্তে?'

'ছুট্ গিয়া হুজুর।'

'ছুট গিয়া—! সোয়াইন!'

বাহাদুর চুপ। কুকুর দুটোকে টেনে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। সোম চলে গেল গ্যারেজে।

বারান্দা পেরিয়ে বিরক্ত, অপ্রসন্ন মনে সোম ঘরে ঢুকল। ড্রয়িং-রুমে। অতসী নেই। শোবার ঘরে এল সোম। বিছানায় শুয়ে রয়েছে অতসী। কোমরের ওপর পর্যন্ত সুতীর চাদর টেনে। চুল এলো-মেলো। মুখের মধ্যে লালচে ভাব একটা। সামান্য যেন ঘাম কপালে। বালিশের পাশে এমব্রয়ডারি ফ্রেমে কী যেন একটা পরানো। সামান্য পিঠ উঁচিয়ে সেটা টেনে নিলে অতসী। লাল রঙের সুতো পরানো ছুঁচটা আঙুলে তুলে নিল।

'বাড়িসুদ্ধ সবাই কী তোমরা মরে গিয়েছিলে?' সোম খেঁকিয়ে উঠল।

'কই, দিব্যি তো বেঁচে আছি।' অতসী আরও একটু পিঠ সোজা করে নিল।

'লক্ষণ তো দেখছি না। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টা ধরে হর্ন দিচ্ছি—কারও কানে ঢুকছে না?'

'যা বৃষ্টি!'

'বৃষ্টি! মালী কোথায়?'

'তাকে বাজারে পাঠিয়েছি বিকেলে। এই বৃষ্টিতেই। মুরগী যোগাড় করে আনতে। এই ওয়েদারে তোমার হয়ত মুরগী ভাল লাগবে ভেবে।' অতসী বলল, পরিহাস করছে না যেন এমন সুর টেনে।

'আর বনমালী? সে কোথায়?'

'তাকে পাঠিয়েছি ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনতে। শরীরটা দুপুর থেকে খুব খারাপ হয়েছিল। মাথা ধরা আর বমি-বমি!'

সোম স্ত্রীর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল।

'ওটা কি?' সোম অতসীর হাতের দিকে তাকিয়ে বলল।

'বাহাদুরের গেঞ্জি। একটা ফুল তুলে দিচ্ছি বুকে। কদিন ধরে পাগল করে মারছে আমাকে।' অতসী হাতের ছুঁচ কাপড়ের মধ্যে ফুটিয়ে দিল।

সোম দু-পা এগিয়ে এল। অতসীর প্রায় গায়ের ওপরই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল স্ত্রীকে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। মুখটা লালচে। কপালে ঘাম। বুকের কাছটা খোলা। হৃদ্‌পিণ্ড যেন ভীষণ শ্রান্ত হয়ে খুব আস্তে আস্তে ধুকধুক করছে।

সোম ছোঁ মেরে অতসীর গা থেকে চাদরটা তুলে ছুঁড়ে দিল বিছানার একপাশে। অতসী চমকে উঠে চুপ করে গেল। তারপরই ভীষণ—ভীষণ একটু রূঢ়তা ও দৃঢ়তায় শান্ত স্থির হয়ে শুয়ে থাকল।

অতসীর শাড়ি বড় এলোমলো হয়েছিল। সোম পট পট করে তার ব্লাউজের দুটো বোতাম খুলে ফেলল। তারপর হঠাৎ কি দেখে ভীষণ-ভাবে চমকে উঠল।

'বাহাদুরের গলার তাবিজটা তোমার বিছানায় কি করে এল?' সোম বিশ্রীভাবে ইতরের মতন চেঁচিয়ে উঠল। পশুর মতন।

অতসী একটুও চমকাল না। কাঁপল না। সোমের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল।

সোম ছটফট করে বিছানার সামনে একটু পায়চারি করল। তারপর হঠাৎ অতসীর গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে সাপের মতন দুই হিংস্র চোখ রেখে বললে, 'আমাকে বাজে কথা বলো না। এ হতে পারে না। নেভার। তুমি নিশ্চয় ওই জানোয়ারটাকে—'

অতসী গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিতে নিতে সামান্য উঠে বসল। সোমের দিকে চাইল, 'এই সংসারটাই তো জানোয়ারের!' ঘৃণায় অতসীর

চোখ, মুখ কুঁচকে উঠল।

সোম হাত বাড়িয়ে অতসীকে, অতসীর গলাটা খপ্ করে ধরতে যাচ্ছিল। হঠাৎ শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। বেডরুমের কাঁচ-আঁটা দরজার বাইরে বাহাদুর দুটো ভয়ংকর জানোয়ারের গলার বক্লস ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সোম পাগলের মতন ছুটে এসে দরজাটায় প্রচন্ড একটা লাথি মারল। ঝনঝন করে একটা কাঁচ বোধ হয় ভেঙে পড়ল মেঝেতে। দরজাটা খুলে গেল। হাট হয়ে।

কুকুর দুটোকে সোমের আর নিজের মধ্যে রেখে বাহাদুর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

সোম বাহাদুরের ভয়ংকর দুই চোখের দিকে তাকাল একবার। আর একবার কুকুর দুটোর ভীতিকর ভঙ্গির দিকে, চোখের দিকে। তিনটে জানোয়ারকে একসঙ্গে দেখে নিয়ে সোম আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে অতসীর দিকে চাইল।

বাহাদুর অন্ধকারে সরে যাচ্ছে না তবু।

আঙুরলতা | খড়ির দাগ

খড়ির দাগ

এ আমাদের ছেলেবেলার গল্প, আমার হাবুলের আর নন্তুর। তখন আমাদের হাফপ্যান্ট পরার বয়েস। আমি আর হাবুল পড়তাম এইট্ ক্লাসে, নন্তু সেভেনে। মধুগঞ্জ একাডেমিতে। থাকতাম স্টেশন যাবার পথে মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি রাখা মাঠটার কাছে, ইঁট্ রঙের খোলার চাল ছাওয়া একটা বাড়িতে। ওটাই ছিল আমাদের বোর্ডিং—স্কুল বোর্ডিং। চারপাশে কাঁঠাল আর জাম গাছ। ক'টা দেবদারু তারই মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, আর ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা কাঠচাঁপাও ছিল। আমরা তার ডালে ডালে ঝুলে একটা খেলা খেলতাম যার নাম ছিল গাছ-চোর। পণ্ডিত মশাই কিন্তু বলতেন বাঁদর-লাফ।

তা আমরা যে বাঁদর এটা প্রায় সারা মধুগঞ্জ শহরই জেনে গিয়েছিল। ইজেরের তলায় শার্ট গুঁজে, খালি পায়ে, হাঁটুভর্তি ধুলো আর এক মাথা রুক্ষ উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে টা টা রোদে কিংবা আকাশভাঙা বৃষ্টিতেও সারা মধুগঞ্জ শহর আমরা চরে বেড়াতাম। হাবুলের হাতে গুলতি, নন্তুর হাতে লাট্টু আর আমার হাতে লাটাই একটা দেখে নি এমন লোক মধুগঞ্জে ছিল না। গরম পড়লে তো কথাই ছিল না, একটা তালি-তাপ্পি মারা তিন নম্বরের ফুটবল হাতে করে আমরা তিন গোষ্ট-পাল মধুগঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় হানা দিয়ে বেড়াতাম। হাবুলটা সাঙ্ঘাতিক খেলত। পায়ে বল পেলেই গোঁ-ধরা শুয়ারের মতন ঘাড়মাথা গুঁজে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ছুটত যতক্ষণ না পায়ের বলটা গোলের মধ্যে কিংবা লাইনের বাইরে চলে যায়। বড়রা ওর খেলা দেখে বলত, বুলেট্ একটা।

হাবুল একা নয়, হাবুলের সঙ্গে সঙ্গে আমরা—আমি আর নন্তুও বুলেট্ হয়ে গিয়েছিলুম। বাংলার টীচার করুণাবাবু বলতেন, এই তিনটে বুলেট্‌কে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল তিনদিকে ছেড়ে দাও, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়ার মতন সব ক'টা ফিরে আসবে।

হাবুলটা ছিল ভীষণ বোকা, কী বলতে হয় আর বলতে নেই জানত না। করুণাবাবুর কথা শুনে ফট্ করে বলে বসেছিল, আপনি স্যার আমাদের অর্জুন হবেন।

করুণাবাবু কিছু না বললেও পণ্ডিতমশাই, যিনি আমাদের স্কুল বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন, তিনি হাবুলের কথা শুনে ভেঙ্চিয়ে উঠে বললেন, তোমাদের আর অর্জুন লাগবে না স্যার, নিজেরাই সব সব্যসাচী। মর্কট্ কোথাকার।

নতুন ড্রিল স্যার কিন্তু মধুগঞ্জ একাডেমিতে আসতে না আসতেই আমাদের খুব ভালবেসে ফেলেছিলেন। বোর্ডিংয়ে এসেই উঠেছিলেন ড্রিল স্যার। ক'দিনের মধ্যেই আমাদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। বোর্ডিং-য়ের সামনে খানিকটা মাটি কুপিয়ে এক্সারসাইজ শেখাতে লাগলেন। কাঁঠাল গাছের ডালে ডালে দড়ি ঝুলিয়ে দড়ি বেয়ে ওঠা নামা, একটা থেকে আর একটাতে টপকে যাওয়া, দুলতে দুলতে লাফিয়ে পড়া—এই-সব। আর মাঝরাতে কাঁঠাল ঝোপের ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে হুতোম পেঁচার ডাক ডাকতেও শিখিয়েছিলেন তিনি। পণ্ডিতমশাই এবং আরো অনেকের এই ডাকটার ভয় ছিল।

ড্রিল স্যারই আমাদের নাম দিলেন, লিট্ল্ লর্ডস।

লিট্ল্ কথাটার মানে বুঝলুম; কিন্তু লর্ডস—লর্ডস মানে কি? ঠিক বুঝলাম না। নন্তু বললে, রাজা। হাবুল বললে, রাজা নয় রে, লাট—ক্ষুদে লাট; আমরা তিনজনে ক্ষুদে লাট। আমি ভাবলুম, রাজা কিংবা লাট না হয়ে যদি বাদশা হই আমরা তাতেই বা ক্ষতি কি!

অনুপমাদিকে কথাটা বলতে ও তো হেসেই অস্থির। হাসতে হাসতে বিষম খেল, মুখে আঁচল চাপা দিল—; তবু সে-হাসি থামতে চায় না। মুখে আঁচল চাপা দিয়েই কড়ি গাছের তলায় ছুটল অনু-পমাদি। পিছু পিছু আমরা। কড়ি গাছের তলায় লম্বা লম্বা ঘাসের বিছানায় শোওয়া-শোওয়া হয়ে বসল অনুপমাদি, মুখের আঁচল সরিয়ে নিল, পাশে ছড়িয়ে দিল—ঘাসের গায়ে। আমরা তাকে ঘিরে বসলুম। অনুপমাদি তার হাসিমাখা সুন্দর মুখে আমাদের তিনজনের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। নন্তুর বুকের বোতামটা এঁটে দিল. হাবু-লের চুলগুলো সরিয়ে দিল কপাল থেকে, আমার শার্টের কলারটা ঠিক করে দিল—তারপর তিনজনের দিকে তিন পলক চেয়ে বলল, তোমরা

তিন চোর, ছিঁচকে চোর। বলেই অনুপমাদি একটু গম্ভীর মুখে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে থাকল—আর তারপরেই খিল খিল করে হেসে উঠল। অনুপমাদির পোষা খরগোশটা পর্যন্ত সেই হাসিতে চমকে উঠে কাঁড়ি গাছের তলা থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

তারপর আমরা হাসলুম—আমরা তিনজনে। নন্তুটা হাসতে হাসতে অনুপমাদির পায়ের কাছে প্রায় লুটিয়ে পড়ল। হাবুল আর আমি যেন কাতুকুতু খেয়ে হাসছিলুম। হাসতে হাসতে তিনজনের চোখেই জল এসে গেল। আমরা যে কেন ছিঁচকে চোর তা বুঝেই সকলে হাসছিলুম।

আর নিশ্চয় সেই কথায় হাবুলের মনে পড়ে গেল। হাসি থামলে হাবুল বলল, 'আমার পাঁচটা হয়েছে অনুপমাদি।' বলে হাবুল হাফ-প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকোলো।

নন্তু তাড়াতাড়ি তার শার্টের পকেট থেকে মুঠোটা বের করে ফেলল। অনুপমাদির আঁচলে টপ্ করে গোটা চারেক চক্ ফেলে দিল। কোনটা ভাঙা কোনটা গোটা। আধখানা নীল চক্, একটা গোটা লাল চক্, বাকি দুটো সাদা—ভাঙা ভাঙা।

অনুপমাদির আঁচলের দিকে চেয়ে আমি মনে মনে হিসেবটা করে ফেললাম। নন্তুর আড়াই হয়েছে। আধখানা নীলে এক, গোটা লাল চক্‌টায় এক—, দুই হল— আর ভাঙা ভাঙা দুটো সাদায় বড় জোর আধ। তা হলে আড়াই।

হাবুল ততক্ষণে তার প্যাণ্টের পকেট থেকে প্রায় এক মুঠো নীল, লাল, হলদে, সাদা চক্ বের করে হাতটা অনুপমাদির দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

অনুপমাদি তার সুন্দর টানা টানা অথচ খুব দুষ্টুমি আর হাসি ভরা চোখ দিয়ে হাবুলকে দেখতে দেখতে বললে, 'তোর আজ কিসের ক্লাশ ছিল রে হাবুল?'

'ভূগোল ছিল, ড্রয়িংও ছিল—' হাবুল বললে।

'তা বুঝেছি।' অনুপমাদি হেসে ফেলল। আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তুই আজ স্কুল যাস নি?'

আমি কিছু বলবার আগেই হাবুল বললে, 'গিয়েছিল অনুপমাদি, কিন্তু একটাও চক্ নিতে পারে নি।'

সত্যি আজ একটাও চক্ চুরি করতে কিংবা চেয়ে-চিন্তে নিতে পারি নি। হাবুলটা সামনের বেঞ্চে যেন ওৎ পেতে বসেছিল। সব ক'টা সেই নিয়েছে।

অনুপমাদি আমার কাঙাল কাঙাল মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল! কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বললে, 'তোকে চুপি চুপি একটা অন্য জিনিস দেব।'

অনুপমাদি হাবুলের চকের হিসেবটা এক নজরে ঠাওর করে নিল। হ্যাঁ, পাঁচটাই বটে। তারপর হাবুল আর নন্তুর গালে হিসেব মতন একে পাঁচটা আর ওকে তিনটে চুমু খেয়ে আঁচলের এক কোণে সব ক'টা চক্ বেঁধে রাখল। কড়ি গাছের তলায় তখন ঘন বিকেলের ছায়া জড়ো হয়েছে। লম্বা লম্বা ঘাসের ডগা হাওয়ায় শিরশির করছে। ক'টা ফড়িং উড়ছে দোপাটি ফুলের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। মাথার ওপর দিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে।

কড়ি গাছের তলায় আমাদের অনুপমাদিকে মাঝে রেখে আমরা তিন-জনে ঘিরে বসে থাকলাম। সূর্যটা তখন ডুবছে। দেবদারু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়ছিল অনুপমাদির কোলের ওপর। পা ছড়িয়ে বসেছিল অনুপমাদি। পরণের কমলা রঙ ছাপা শাড়িটার ফুলের ওপর এক মুঠো আলো যেন একটা ফুলকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। অনুপমাদির হাতের চুড়ি চিক চিক করছিল আর সুন্দর দুটি হাত মাঝে মাঝে নড়ছিল।

আমরা তিনজনে অনুপমাদির মুখের দিকে হাঁ করে চেয়েছিলুম। লম্বা সুন্দর কপালের তলায় অনুপমাদির সেই হাসি হাসি খুশী হওয়া চোখ দুটো একটু যেন আনমনা হয়ে দূরে খরগোশটার ছুটোছুটি আর খেলা দেখছিল। সাদা সাদা দাঁতের গোড়ায় ঘাসের শিষ কাটছিল অনু-পমাদি—আর ঘাড়ের পাশ থেকে বিনুনীটা বুকের ওপর টেনে ছবির মতন বসেছিল।

হাবুলটা চুপ থেকে থেকে হঠাৎ বললে, 'অনুপমাদি তুমি আমাদের নতুন ড্রিল স্যারকে দেখেছ?'

অনুপমাদি চোখ সরিয়ে নিয়ে হাবুলের দিকে চাইল, 'না।'

'ওমা এখনো দেখো নি। এই রাস্তা দিয়েই তো স্কুলে যান।' হাবুল অবাক।

'কি রকম দেখতে!' অনুপমাদি হাসি হাসি মুখ করেই জিজ্ঞেস করল, 'খুব লম্বা—কালো—?'

'লম্বা নয় তো।' নন্তু বললে, 'বেঁটে বেঁটে, খুব সুন্দর শরীর, ভীষণ জোর গায়ে।'

'কুশবাবু তো ফরসা।' আমি বললুম।

'কুশবাবু—?' অনুপমাদি হেসে উঠল, 'তোদের ড্রিল স্যারের নাম কুশ! লব তবে কে?'

লব কে আমরা কি করে জানব? চুপ করে থাকলাম তিনজনে।

একটু চুপ চাপ। অনুপমাদি হঠাৎ বললে, 'তোদের ড্রিল স্যার তোদের খুব ভালবাসে, না—'

'হ্যাঁ।' তিনজনেই আমরা একসঙ্গে মাথা নাড়লুম।

'আমার চেয়ে বেশি?' অনুপমাদি আচমকা বিদঘুটে এক প্রশ্ন করে তিনজনের দিকে এক একবার করে তাকাল।

তাই তো! আমরা তিনজনেই গন্ডগোলে পড়ে গেলাম। ড্রিল স্যার কি আমাদের অনুপমাদির চেয়েও বেশি ভালবাসে? ড্রিল স্যার সবে নতুন এসেছে—আর অনুপমাদির সঙ্গে আমাদের ভাব এক বছর হতে চলল প্রায়। গতবার সেকেন্ড টারমিনাল পরীক্ষার সময় অনুপমাদিরা এখানে এসেছে—আমাদের বোর্ডিংয়ের কাছাকাছি এই বাড়িটায়। তখন থেকেই অনুপমাদির সঙ্গে আমাদের ভাব।

আমাদের তিনজনকে ঘাবড়ে যেতে দেখে অনুপমাদি একটু ভুরু কুঁচকে বললে, 'বলছিস না যে কিছু?'

হাবুল আমার আর নন্তুর মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ফস্ করে বলে ফেলল, 'তুমিই বেশি ভালবাস—, অনেক বেশি।'

হাবুলের বলার ভঙ্গিতে অনুপমাদি হেসে ফেলল। বললে, 'কি করে বুঝলি?'

কি করে যে হাবুল বুঝল তা আমরাও জানি না। তবে হাবুল যে ঠিক ধরেছে আর সত্যি কথাটা বলেছে আমরা তা মনে মনে বুঝতে পারছিলুম।

আমাদের প্রত্যেকের দিকে এমন করে চাইল অনুপমাদি যেন জবাবটা পাশ থেকে কেউ বলে দিয়েছে—শুনে শুনে হাবুল বলেছে। ক্লাশে পড়া পারলে পন্ডিতমশাইও এই ভাবে আমাদের দিকে তাকান। অবি-

শ্বাসের চোখে।

কিন্তু না, অনুপমাদি অবিশ্বাস করে নি—ওই রকম একটা ভাব করেছিল এই যা। একটু পরেই মুখ ভরে আবার সেই হাসি খুশী ভাবটা উথলে থাকল। ঘাসের ওপর থেকে আঁচলটা তুলে কোমরে জড়াতে জড়াতে অনুপমাদি বললে, 'পেঁপের মোরব্বা খাবি?'

তিনজনেই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লুম। 'শুধু পেঁপের মোরব্বা নয় অনুপমাদি সেই তেঁতুলের আচারও খাব।'

'বোস তবে, আনি।' অনুপমাদি বিনুনীটা পিঠে ঠেলে দিয়ে ঘাস পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে যাচ্ছিল এঁকে বেঁকে। আর আমরা তিনজন কড়ি গাছের তলায় বসে তাই দেখছিলুম মুগ্ধ হয়ে।

তারপর হবো-হবো সন্ধ্যেয় যখন অনুপমাদিকে মাঝে রেখে আমরা তিন মূর্তিমান পেঁপের মোরব্বা আর তেঁতুলের আচার খেতে খেতে বার বার হেসে হেসে উঠছিলাম তখন নন্তু বললে, 'ওইটুকু থাক অনুপমাদি—ড্রিল স্যারের জন্যে নিয়ে যাব। বেশ হবে।'

নন্তুর কথায় আমাদের ক'জনেরই হাত থেমে গেল। নন্তুটা তো দিব্যি কথাটা বলেছে। ড্রিল স্যার সেদিন আমাদের অনেকটা করে ডালমুঠ খাইয়েছেন। আমরা যদি পাল্টা মোরব্বা আর আচার খাওয়াতে পারি, তোফা হবে!

হাবুল বললে, 'ভাগ্ গাধা কোথাকার। ড্রিল স্যার কি আমাদের এঁটো খাবেন নাকি?' বলে হাবুল একটু থামল, তারপর অনুপমাদির দিকে তাকিয়ে বললে আবার, 'তুমি যদি আরও খানিকটা আনো অনুপমাদি—ড্রিল স্যারের জন্যে নিয়ে যাই। গ্র্যান্ড্ হবে তা হলে, না—!'

অনুপমাদির মুখটা কিন্তু ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। ভুরু কুঁচকে হাবুল আর নন্তুর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবল অনুপমাদি, তারপর ধমকের সুরে বলল, 'নিজেরা খাচ্ছ খাও—পরের জন্যে আর মাথা ঘামাতে হবে না।'

ধমক খেয়ে তিনজনেই বুঝি আর না বুঝি চুপ করে হেঁট মুখে তেঁতুলের আচার খেতে লাগলাম।

হঠাৎ সব চুপচাপ। কড়ি গাছের মাথা টপকে একটা বিদঘুটে পাখি ডাক দিয়ে উড়ে গেল। কলাফুলের পাতাগুলো হাওয়ায় যেন বড় বেশি কাঁপতে লাগল, আর সন্ধ্যের অন্ধকারটা আচমকা এমন ঘন হয়ে এল যে

অনুপমাদির মুখটা বড় অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

অমন চুপচাপের মধ্যে অনুপমাদি বললে, 'তোদের ড্রিল স্যারের কাছে আমার গল্প করেছিস বুঝি!'

তাড়াতাড়ি আমরা মাথা নাড়লুম—তিনজনেই। না, করি নি।

'খবরদার। আমার কথা বলবি যদি কখনো তো কারুর আর মুখ দেখব না আমি।' অনুপমাদি শাসিয়ে দিল।

তারপর আমরা উঠলুম। কড়ি গাছের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনুপমাদি আমাদের খানিকটা এগিয়ে দিল। বাগানের শেষটায় এসে থমকে দাঁড়াল। কোমরের আঁচলটা খুলে পিঠের ওপর দিয়ে টেনে নিল। কী যেন বলিবলি ভঙ্গি। একটু দাঁড়িয়ে থেকে বললে, হঠাৎ খুব মোলায়েম আর ঠাট্টার গলায়, 'তোদের ড্রিল স্যারকে তা বলে আমি ভয় পাই না, বুঝলি—; কেয়ার করি না। যা খুশী বলতে পারিস। বলিস না—তোদের আমি ছিঁচকে চোর বলেছি; দেখি তোদের লবকুশ কি করতে পারে! অনুপমাদি কথাগুলো বলতে বলতে একেবারে আগে-কার মত হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর সন্ধ্যের প্রথম অন্ধ-কারে হাসতে হাসতে ফিরে চলে গেল। আমরা তিনজন তাকিয়ে তাকিয়ে অনুপমাদির সেই নাচের ভঙ্গি করে চলে যাওয়া মূর্তিটা যতক্ষণ দেখা গেল দেখলাম।

অনুপমাদি যাই বলুক—আমরা কি আর সত্যি ড্রিল স্যারকে ও-কথা বলতে পারি! মরে গেলেও না। নিজেদের মধ্যে আমরা বলাবলি করেছি, ড্রিলস্যার তো অনুপমাদির মাস্টার নন যে তাকে মান্য করতে হবে. ভয় পেতে হবে! নাই করুক কেয়ার অনুপমাদি ড্রিলস্যারকে, আমাদের কি!

হ্যাঁ, আর অনুপমাদি আমাদের চোর বলেছিল—ছিঁচকে চোর। আমরা তার জন্যে একটুও কেউ রাগ করি নি—বরং আগেও হাসাহাসি করেছিলাম, পরেও হেসেছি। চোর তো ঠিকই। খড়ি চোর। আমরা—হাবুল, নন্তু আর আমি হামেশাই স্কুল থেকে চক্ চুরি করতাম।

চক্ চুরি করাটা আমাদের কাছে এক ধরণের খেলা হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। সব চেয়ে সুন্দর আর ভাল খেলা। এই খেলাটা হঠাৎ কি ভাবেই না শুরু হয়ে গেল! অনুপমাদির সঙ্গে আমাদের ভাব হবার পরেই।

হ্যাঁ, অনুপমাদিরা তখন সবে এসেছে এখানে। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি রাখা মাঠটার ও-পাশের সাদা বাড়িটায়। আমাদের বোর্ডিং থেকে মাত্র এক ছুটের পাল্লা। একদিন শিউলি ফুল কুড়োতে গিয়ে ভাব হয়ে গেল।

আমরা হেঁট হয়ে শিউলি ফুল কুড়োচ্ছিলাম—হঠাৎ খস্ খস্ পায়ের শব্দ। মুখ তুলে দেখি গাঢ় নীল শাড়ি পরা, বিনুনী ঝুলানো একটি মেয়ে। ফরসা ফরসা রঙ, কানে দুল; আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মনে হল, ওদের বাগানে ফুল তুলতে এসেছি বলে হয়ত ধমকাবে।

হাবুল কয়েকটা চাঁপা তুলেছিল। তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে ফেললে। আমরা তিনজনে পাশাপাশি এমন ভাবে দাঁড়ালাম যাতে মেয়েটা কিছু বললেই এক ছুট লাগাব।

হাত দুটো কোমরে রেখে মেয়েটা আমাদের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকল। তারপর আচমকা শুধলো, 'কি করবি রে ফুল ?'

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। হাবুল বললে একটু পরে, 'সেণ্ট্ তৈরি করব।'

'সেণ্ট্ তৈরি করবি!' মেয়েটা অবাক। দু' পলক হাবুলকে দেখে দেখে হঠাৎ ধমকে উঠল, 'ভাগ্, মিথ্যেবাদী!' আবার একটু চুপ, তার-পর ও বললে, 'এই ফুল দিয়ে সেণ্ট্ হয় নাকি, মুখ্যু কোথাকার!'

জানা নেই শোনা নেই কোথাকার কে একটা মেয়ের কাছে দু-দুবার ধমক খেয়ে, মিথ্যেবাদী আর মুখ্যু শুনে হাবুল গুম হয়ে গেল। আমরাও।

মুখটা গোঁজ করে হাবুল বললে, 'হয়—নিশ্চয়ই হয়।'

'কি করে করবি ?' মেয়েটা মজা পেয়ে হাসল।

'বলব কেন ?' সঙ্গে সঙ্গে হাবুলের জবাব।

হাবুলের জবাবে আরও মজা পেয়ে গেল যেন মেয়েটা। খিল খিল করে হেসে উঠল। সাদা দাঁতগুলো চিক চিক করছিল আর গালে একটা টোল উঠে বুদ্বুদের মত ভাঙি ভাঙি অবস্থা। চোখের পাতা কাঁপাতে কাঁপাতে ও বললে, 'না বললে ফুল নিয়ে যেতে দেব না।'

ফুল নিয়ে যেতে দেবে না! বলে কি মেয়েটা! আমাদের কাছ থেকে ফুল কেড়ে নেবে! অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে আমরা চাইলাম তার দিকে।

'তোদের নাম কি রে?' ও শুধলো হঠাৎ।

নাম বললাম।

'কোথায় থাকিস?'

'বোর্ডিংয়ে।'

'বোর্ডিংয়ে—ওই বাড়িটায়!' আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মেয়েটা আপন মনে যেন বললে। তারপর শুধলো, 'কোন্ ক্লাসে পড়িস?'

হাবুল এ-বারও জবাব দিল। দিয়েই পাল্টা প্রশ্ন করলে, 'আপনার নাম কি?'

'অনুপমা।' ও বললে। বলে এগিয়ে এসে গাছতলা থেকে এক-মুঠো ফুল কুড়িয়ে নন্তুর হাতে গুঁজে দিল। হেঁট হয়ে আরও ফুল কুড়োতে লাগল।

বা, বেশ নাম। মনে মনে আমরা ভাবলুম।

'আপনি মেয়ে স্কুলে পড়বেন?' নন্তু বোকার মতন বলে বসল।

'না। আমি পড়ি না আর; ছেড়ে দিয়েছি।'

এর পর আরও দু-একটা কি কথা হল। ভাব হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আসার সময় অনুপমাদি বললে—হ্যাঁ, সেই তখনই ও বলে দিয়েছিল ওকে অনুপমাদি বলে ডাকতে—'তোরা আসিস যখন খুশী, আমরা চারজনে গল্প করব, খেলব, কেমন?'

আমরা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলেছিলুম—'আসব, আসব রোজ আসব।'

তার পর থেকে রোজই প্রায় যেতাম অনুপমাদির কাছে। ও-বাড়িতে মানুষ খুব কম ছিল; অনুপমাদি, অনুপমাদির বাবা আর পিসি। আর কেউ না। অনুপমাদির মা ছিল না, ভাই বোন কেউ না। আমা-দের মধ্যে হাবুলেরও মা ছিল না; নন্তুর মা আবার সৎমা। কি জানি কেন, এ-সব গল্প আমাদের আগে আগেই হয়ে গিয়েছিল। আরও কত যে গল্প হত। অনুপমাদিই বলত, আমরা শুনতাম। গল্প হত আর সেই সঙ্গে লুডো খেলতাম, কিংবা স্নেক লেডার। অনুপমাদি আর হাবুল প্রায়ই জুটি বাঁধত, আর জিতত।

এ-ছাড়াও খেলা ছিল। আমরা বাগানে কতদিন কত রকম খেলা খেলেছি, ছুটোছুটি—হুড়োহুড়ি—এমন কি আমগাছের ডালে দোলনা ঝুলিয়ে ছিলাম—; দুলতাম।

তখনই একদিন নন্তু একটা চক্ নিয়ে গিয়েছিল—নীল চক্—গোটা চক্। অনুপমাদিকে দিতেই অনুপমাদি খুব খুশী। আহ্লাদে আট-খানা। নন্তুর দু'গালে দুটো চুমু খেয়ে ফেলল। বললে, 'ইস্—তুই কি করে বুঝলি রে! চক্ আমার বড্ড ভাল লাগে! এই রঙীন চক্-গুলো এমন সুন্দর! সিমেণ্টের মেঝেতে ছবি আঁকা যায়, কাঠের ওপরেও। দেখিস পিঁড়ির ওপর কাল একটা কেমন সুন্দর ফুল এঁকে রাখব।' বলেই একটু থামল অনুপমাদি, 'কিন্তু শুধু নীলে তো হবে না—লাল চাই, হলদে চাই, সাদা চাই—!'

পরের দিনই হাবুল, নন্তু আর আমি ক'টা রঙীন আর সাদা চক্ নিয়ে গিয়ে দিলাম অনুপমাদিকে। অনুপমাদি একেবারে আনন্দে আকুল হয়ে গেল। এত খুশী হতে ওকে আমরা আর দেখি নি। ছুটে গেল একটা পিঁড়ি আনতে। তার পর কোমরে আঁচল জড়িয়ে তার ওপর এক ফুল আঁকতে বসল। আমরা ওর চারপাশে হাঁটু গেড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে বসে সেই আঁকা দেখতে লাগলুম।

ফুল আঁকা শেষ হল। অনুপমাদির সুন্দর হাত। সুন্দর এঁকে-ছিল ফুলটা। আমরাও খুব খুশী। সেই খুশীর হুল্লোড়ের মধ্যে অনুপমাদি আমাদের সবাইকে—তিনজনকেই—দুটো তিনটে করে চুমু খেয়ে ফেলল।

সেই থেকে, যদিও অনুপমাদি কোনদিন মুখে কিছু বলে নি, আমরাও জিজ্ঞেস করি নি,—জানতে চাই নি—তবু কেমন করে বুঝে ফেলেছিলাম অনুপমাদিকে চক্ দিতে পারলে তার কাছে আমাদেরও পাওনা হবে। আর অনুপমাদিও যেন জানতে পেরেছিল আমরা কি চাই। নীল চক্, লাল চক্, হলদে চক্—গোটা আর ভাঙা চক্—কোন্-টাতে কত—তার হিসেবটাও এমন সহজ সরল ভাবে, উচ্চবাচ্য কিছু না করেই ঠিক হয়ে গেল যে—আমরা সবই বুঝতে পেরে গেলাম।

অনুপমাদিরও হাতে ক'টা চক্ তুলে দেবার জন্যে তারপর থেকে আমাদের তিনজনের—হাবুল, নন্তু আর আমার যে কী ভীষণ অধ্যবসায় ছিল তা বলার নয়। রঙীন চক্ বড় কম জুটত। ড্রয়িংস্যারের সপ্তাহে একটা পিরিয়ড ছাড়া রঙীন চক্ ক্লাসেই আসত না; আর কখনো-সখনো ভূগোলের টীচার মাধববাবু যদি ম্যাপ আঁকবার সময় আনতেন। নয়ত সারা সপ্তাহ—সব ক'টা পিরিয়ডেই শুধু সাদা চকের লেখা-জোখা।

আমরা জানতুম সাদা চকের তেমন দাম নেই, তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালর মতন ক্ষয়ে যাওয়া, ভাঙা, টুকরো টুকরো সেই চকের জন্যেও ক্লাস শেষ হলেই মাস্টার মশাইদের পিছু ধাওয়া করতুম।

যা হয়, হওয়া স্বাভাবিক—আমরা আস্তে আস্তে চক্ চুরি করতে শুরু করে দিলাম। কেরাণী বাবুর কাছে গিয়ে, টীচার্স রুমে ঢুকে, কোন্ ক্লাসে ড্রইং আছে তার খবরাখবর রেখে সারাটা দুপুরই প্রায় চক্ যোগাড়ের ধান্দায় থাকতুম। সুযোগ সুবিধে পেলেই সেরেফ্ চুরি করতুম।

অনুপমাদির সঙ্গে আমাদের এই চক্ দেওয়া আর চুমু পাওয়ার খেলা আরও পাঁচটা খেলা গল্প হুড়োহুড়ির সঙ্গে এমন সুন্দর ভাবে মিশে গিয়েছিল যে এটা যে আলাদা কিছু অন্য কিছু তা আমরা কেউ ভাবতেও পারতাম না। খালি এ-টুকু বুঝতাম এর একটা অন্য রকম সুখ আছে, আনন্দ আছে। খুব ভাল লাগত, হয়ত বেশিই ভাল লাগত একটু।

সত্যি বলতে, আমাদের—আমাদের তিনজনের আর কেই বা ছিল সেই মধুগঞ্জে—যে একটু আদর করবে, ভালবাসবে; আমাদের সঙ্গে গল্প করবে, বকবে, নখ কেটে দেবে, ছেঁড়া জামা সেলাই করে দেবে, বোতাম বসিয়ে দেবে? কেউ ছিল না এক অনুপমাদি ছাড়া। অনুপমাদিই শুধু এই তিনটে বাচ্চা ছেলের—যারা ঘরছাড়া, ঘরের সুখ ছাড়া, মাতৃহীন—অবোধ এবং দুরন্ত আর আদর-কাঙাল—তাদের বন্ধু ছিল, নিজের ছিল। আর কেউ নয়।

একটা তুলনা প্রায়ই মনে হয়; আমরা তিনটি বালক যেন ছিলাম তিনটি চারা আর অনুপমাদি ছিল তিন চারার মাঝখানে একটি ফোয়ারা। তার সেই স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার মত জলে আমরা যেন ভিজে ভিজে বড় হচ্ছিলাম, সেই ফোয়ারার চারপাশে সূর্যের আলোয় যে রামধনু ফুটে থাকত সর্বক্ষণ—আমরা যেন সেই রামধনুর রঙ দেখে দেখে মুগ্ধ তন্ময় হয়ে ছিলুম।

অনুপমাদি বারণ করেছিল ড্রিল স্যারকে যেন তার কথা না বলি। আমাদের ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য ছিল না অনুপমাদির নিষেধ অমান্য করি। কিছুই বলি নি আমরা। কোনো কথাটি নয়।

অথচ অনুপমাদি যেন সেটা বিশ্বাস করতে পারত না। অন্তত

পারছিল না। মাঝে মাঝেই আচমকা জিজ্ঞেস করত, 'কিরে, বলেছিস তো তোদের ড্রিলস্যারকে?'

'না, না, না': আমরা তিনজনে মাথা নাড়ি।

'না তো কি বললি যখন তোর আঙ্গুলে পট্টি বাঁধা দেখল ড্রিল স্যার?' নন্তুর দিকে চেয়ে অনুপমাদি শুধলো।

ব্যান্ডেজ জড়ানো কাটা আঙ্গুলটা দেখতে দেখতে নন্তু বললে, 'কিচ্ছু তো বলে নি ড্রিলস্যার!'

'কিচ্ছু বলে নি! মিথ্যে কথা বলছিস!' অনুপমাদি চোখ পাকাল।

'সত্যি বলছি কিচ্ছু জিজ্ঞেস করে নি ড্রিলস্যার—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।' নন্তু অনুপমাদির গা ছুঁয়ে দিব্যি করে ফেলল।

আর একদিন। অনুপমাদি আমাকে বললে, 'হ্যাঁরে, তোদের ড্রিল-স্যারকে দেখিয়েছিস তো?'

'কি?' আমি অবাক।

'কি, জানিস না; ন্যাকামি হচ্ছে!' অনুপমাদি কেমন যেন ভেঙ্চে উঠল আমাকে। 'তোকে যে একটা রুমাল তৈরি করে দিলাম—দেখাস নি সেটা? ওই শেষ—আর দিচ্ছি না—কাউকে না'—অনুপমাদি নন্তু আর হাবুলের দিকে তাকাল। অর্থ ওদের প্রাপ্য ওরা আর পাচ্ছে না।

ড্রিলস্যারকে সত্যিই আমি রুমাল দেখাই নি। সে-রুমাল আমার আড়াই ফুটের ভাঙা বাক্সেই লুকানো আছে। বললাম কথাটা অনু-পমাদিকে—দিব্যি করলাম, তবু যেন বিশ্বাস করলে না অনুপমাদি।

এমনি সব কান্ড। প্রায়ই। আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছিলুম না অনুপমাদি কেন মিছি মিছি আমাদের এতো অবিশ্বাস করছে। আমরা আজকাল পারতপক্ষে ড্রিলস্যারের কথা তুলতুম না, তুলতে চাই-তাম না—কিন্তু অনুপমাদি কথায় কথায় সেটা টেনে আনত। তারপর এমন সব কথা বলত যাতে মাঝে মাঝে দুঃখ হত আমাদের, রাগ হত। ড্রিলস্যার তো আমাদেরই স্যার—তাকে অত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ভাল লাগত না।

হাবুলের যখন জ্বর হল, অনুপমাদি বললে আমাকে, 'এই কাল আমায় নিয়ে যাবি বোর্ডিংয়ে—হাবুলকে দেখে আসব। দুপুরে নিয়ে যাবি—বুঝলি; তোদের ড্রিলস্যার যখন থাকবে না বোর্ডিংয়ে।'

মাথা নাড়লুম। দুপুরেই নিয়ে যাব।

পরের দিনু স্কুল কামাই করে অনুপমাদিকে নিয়ে যেতে এলাম দুপুরেই। যাচ্ছি যাচ্ছি করে দেরী করল অনুপমাদি নিজেই। যখন বেরুল তখন চারটে প্রায় বাজে বাজে। বোর্ডিংয়ে গিয়ে হাবুলের খাটের পাশে খানিকটা বসতে না বসতেই বোর্ডিংয়ের ছেলে আর মাস্টার মশাইদের ফেরার সময় হয়ে গেল। একে একে সবাই ফিরে আসতে লাগল।

অনুপমাদি চমকে ওঠার মতন করে, বললে, 'কি রে, স্কুল ছুটি হয়ে গেছে তোদের—সবাই ফিরে আসছে যে!'

ভয়ে ভয়ে নন্তু আর আমি মাথা নাড়লাম।

অনুপমাদির মুখের ওপর ভীষণ একটা বিরক্তি ফুটে উঠল। আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম, রাগ করেছে ও—সাংঘাতিক চটেছে।

হাবুলের পাশ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অনুপমাদি বললে, 'তোদের ড্রিলস্যার ফিরে এসেছে নিশ্চয়। ছি-ছি—। যা বারণ করলাম তাই। এখন—! কোন্ দিক দিয়ে আমি যাই। এখুনি যদি এ-ঘরে এসে ঢুকে পড়ে লোকটা—!' অনুপমাদি ছটফট করতে লাগল।

নন্তু বললে, 'আমি দেখে আসি এক ছুটে।'

সত্যিই, এক ছুটেই দেখে এল নন্তু। বললে, 'না, ড্রিলস্যার এখনো আসেন নি।'

অনুপমাদি কথাটা শুনল কি না কে জানে—কি ভাবছিল। বললে, 'তাহলে তো আরও মুশকিল—রাস্তায় যেতে যেতে ঠিক দেখা হয়ে যাবে।' ঘরের মধ্যে ছটফট করে আবার খানিক পায়চারি করল অনুপমাদি। জানলা দিয়ে দেখল। হাবুলের বিছানায় এসে বসে পড়ল। আর বার বার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিরক্তি ও হতাশার শব্দ করতে লাগল।

আমি বললুম, 'বোর্ডিংয়ের পেছন দিয়ে একটা রাস্তা আছে—যাবে—?'

'থাক্ থাক্—তোকে আর সাধু সাজতে হবে না। বদমাস ছেলে কোথাকার! বার বার বলেছিলুম না তোকে সকাল সকাল যাবি! বিকেল করে উনি আমায় আনতে গেলেন।' অনুপমাদির ভুরু কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মুখ কুঁচকে যাচ্ছিল।

আরও একটু বসে থেকে অনুপমাদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'চল্ —সোজা রাস্তা দিয়েই যাব। দেখলেই বা, তোদের ড্রিলস্যার—হয়েছেটা

কি! আমি কি তাকে ভয় পাই!'

আমি আর নন্তু অনুপমাদিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকট এগিয়েছি, মিউনিসিপ্যালিটির মাঠের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি সবে, কাঁঠাল-তলা দিয়ে, পথটাও সরু—হঠাৎ দেখি ড্রিলস্যার। একেবারে সামনা-সামনি।

আমরা প্রায় চমকে উঠে বললুম, 'ড্রিলস্যার!'

অনুপমাদি থমকে দাঁড়াল। ড্রিলস্যার ততক্ষণে কাছাকাছি এসে গেছে। কি হবে, কি হবে—আমরা ভাবছিলুম, বুক দুর দুর করছিল। কিন্তু কিছুই হল না। অনুপমাদি দাঁড়িয়ে থাকল একটু—ড্রিলস্যারও চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল—তার পর অনুপমাদি হঠাৎ সর সর করে পিঠের আঁচলটা হাওয়ায় দুলিয়ে ড্রিলস্যারকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

অনুপমাদির কাছে আমাদের কত যে গালাগাল আর বকুনি জমা থাকল—এর পর শুধু তাই ভেবেছি। হ্যাঁ, ড্রিলস্যারকে পাশ কাটিয়ে যাবার পর অনুপমাদি আর একটা কথা বলে নি আমাদের সঙ্গে, মুখটা গম্ভীর থমথম করছিল। আমরাও ভয়ে আর কথা বলতে পারি নি।

পরের দিন আর অনুপমাদির কাছে যেতে সাহস হল না। তার পরের দিনও। হাবুলের জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল এর মধ্যে।

হাবুল বললে, 'জানিস ড্রিলস্যার অনুপমাদির কথা জিজ্ঞেস কর-ছিল!'

আমরা জানতাম ড্রিলস্যার অনুপমাদির কথা জানতে চাইবেন। হাবুলের কথায় অবাক হলাম না। কিন্তু ভয় হল হাবুল কি বলেছে কে জানে অনুপমাদি জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না। 'কি বললি তুই?' আমি শুধলাম।

হাবুল যা জবাব দিল তাতে অবশ্য তেমন ভয় পাওয়ার মতন কিছু ছিল না। ও শুধু নাম বলেছে অনুপমাদির, নাম আর বাড়িটার কথা. আমাদের সঙ্গে যে ভাব আছে শুধু সে-টুকু। আর কিছু নয়।

দিন তিনেক পরে হাবুল বললে, 'চল্ আজ অনুপমাদির বাড়ি যাই।'

নন্তুও রাজী। আমার তবু খানিক ভয় ভয় করছিল।

হাবুল সাহস দিল। বললে, 'ভয় কিসের, আমরা কি আর সেধে ড্রিলস্যারকে অনুপমাদির কথা বলতে গেছি। রাস্তায় তোদের সঙ্গে

না দেখলে কি আর ড্রিলস্যার জিজ্ঞেস করত? জানতেই পারত না।’

হাবুলের সাহসে সাহস পেলাম। গেলাম অনুপমাদির বাড়ি। তিন জনেই।

আশ্চর্য, অনুপমাদি আগের মতনই গল্প করল, খাবার খাওয়াল, আদর করল—কিন্তু একবারও ড্রিলস্যারের কথা বলল না। আমাদের ভয় ছিল অনুপমাদি নিশ্চয় জানতে চাইবে ড্রিলস্যারকে আমরা কি বলেছি। কিংবা রাস্তায় দেখে ড্রিলস্যার আমাদের কাছে কিছু জানতে চেয়েছিলেন কি না।

অনুপমাদি সে পথ মাড়াল না। আমরাও বাঁচলুম।

এর পর আগের মতই আমরা যেতে আসতে শুরু করলাম।

মাস খানেক পরে—একদিন অনুপমাদি হঠাৎ বললে, ‘হ্যাঁরে তোদের ড্রিলস্যার নাকি রাত্তির বেলায় ঘুমোয় না!’

ঘুমোয় না! আমরা তিনজনে তিনজনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। ড্রিলস্যার ঘুমোয় না! কে বললে!

অনুপমাদি আমাদের মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল। কেউ জবাব দিচ্ছি না দেখে হঠাৎ কি ভেবে হেসে উঠল আপনমনেই। বললে, ‘লোকটা বোধ হয় ভূত!’

আর একদিন অনুপমাদিকে দোলনায় বসিয়ে আমরা দুলোচ্ছি আর পেয়ারা চিবোচ্ছি—হঠাৎ দোলনা থামিয়ে অনুপমাদি চুপ করে বসে থাকল। ঘাড় নেড়ে আমাদের পাশে ডাকল। বলল, ‘আচ্ছা, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলত—আমার মুখ দেখলে কি মনে হয় আমি—আমি খুব নিষ্ঠুর!’

অনুপমাদি নিষ্ঠুর! কে বললে? আমরা খানিকটা বোকার মতন তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমাদের চুপ করে থাকতে দেখেই হোক কি অন্য কোনো কথা ভেবেই হোক অনুপমাদি হেসে উঠল। বলল, ‘দূর, আমি নিষ্ঠুর হব কেন, বরং হ্যাঁ—তোদের ড্রিলস্যারের মুখটা দেখলে সেই রকম মনে হয়, কাঠখোট্টা গোঁয়ারগোবিন্দ, দয়ামায়া নেই। না—?’

আমরা অনুপমাদির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলুম। কথা বললুম না, মাথা নাড়লুম না। বুঝতেই পারছিলাম না কিছু।

আর একদিন—সেদিন ঘরে বসে লুডো খেলছিলাম চারজনে—

হাবুল, নন্তু, আমি আর অনুপমাদি। অনুপমাদি আর হাবুল জোড় বেঁধেছিল—, আমি আর নন্তু। অনুপমাদির যে কি হয়েছিল সেদিন কে জানে—বার বার চাল ভুল করছিল, গুটি কাটতে পারছিল না, হেরে যাচ্ছিল।

এদিকে আকাশ কালো করে মেঘ জমে উঠছিল বাইরে। দমকা হাওয়া বইছিল। খেলতে খেলতে অনুপমাদি হঠাৎ দু-হাতে লুডোর বোর্ডটা উল্টে দিয়ে উঠে পড়ল। বললে, 'চল বাইরে যাই, বাগানে। ভাল লাগছে না খেলতে।'

অনুপমাদির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাগানে এলাম। ঝড় উঠেছিল বাইরে। ঝাঁকড়া মাথা গাছপালার ডালগুলো লুটোপাটি খাচ্ছিল, খড়-কুটো উড়ছিল।

অনুপমাদি খানিকটা এ-দিক ও-দিক করল। একবার ঘাসে বসল, একবার ঝড়ের মধ্যেই দোলনায় বসে দুলতে লাগল। নেমে এল। অনুপমাদির শাড়ি উড়ছিল হাওয়ায়, মাথার চুল মুখে এসে পড়ছিল। হঠাৎ আমাদের তিনজনকে কাছে ডেকে অনুপমাদি বললে, 'তোরা বোর্ডিং চলে যা। ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হবে, দেখছিস না আকাশের অবস্থা!'

আমরা ভাবছিলাম—ঝড় বা বৃষ্টি এলেই বা কি! জলে তো পড়ে নেই আমরা! অনুপমাদির বাড়িতে আছি। বৃষ্টি এলে ঘরে গিয়ে বসব। বৃষ্টি থামলে এক দৌড়ে বোর্ডিং।

'এক্ষুনি!' হাবুল অবাক হয়ে বলল, 'আসুক না বৃষ্টি—!'

'না, না—' অনুপমাদি মাথা নাড়া দিল, ঝড়বৃষ্টিতে বাইরে থাকতে হবে না, পরের বাড়িতে। নিজেদের বোর্ডিংয়ে ফিরে যা।'

তবু যেন পা নড়তে চাইছিল না আমাদের।

অনুপমাদি আচমকা বলল আবার, পালা শীঘ্র। এর পর তোরা ভিজবি না হয় রাত করে বোর্ডিং ফিরবি—আর তোদের ড্রিলস্যার বলবে, আমি তোদের মাথা খাচ্ছি।'

হাবুল সামান্য একটু দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের ডাকল, 'আয়।' ডাক দিয়েই ও ছুটল। পিছু পিছু আমরা।

বৃষ্টি নামল আরও একটু পরে—আমরা বোর্ডিং পৌঁছে যাবার পর। সেই বৃষ্টি একটানা সন্ধ্যে পর্যন্ত চলল। তারপরও ঝিরঝির লেগে থাকল। বোর্ডিংয়ের চারপাশে অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেল, ব্যাঙ ডাকতে

লাগল আর রাশ রাশ জোনাকি উড়তে লাগল কাঁঠাল-আমের ঝোপে।

রাত্রে ঘুমোতে এসে হাবুল হঠাৎ বললে, 'দেখলি তো, অনুপমাদি আমাদের ড্রিলস্যারের ভয় দেখিয়ে পাঠিয়ে দিল অথচ ড্রিলস্যার এখনো ফেরেন নি বোর্ডিংয়ে।'

কথাটা ঠিক। নন্তু বললে, 'কোথায় গেছে রে ড্রিলস্যার?'

আমরা কেউ জানতাম না কোথায় গেছেন ড্রিলস্যার। জবাবটা কেউ আর দিল না।

সেদিন ভীষণ একটা সুযোগ এসে গেল। ড্রয়িংস্যার গিয়েছিলেন কলকাতায়। ফিরে এলেন একগাদা স্কুলের জিনিস নিয়ে। একটা গ্লোব ছিল, ক'টা ম্যাপ, কিছু বই—আর পাঁচ বাক্স চক্। সাদা তিন বাক্স। রঙীন দু' বাক্স। পেস্ট বোর্ডের ছোট ছোট বাক্স—। আমাদের চোখে পড়ে গেল। বোর্ডিংয়েই থাকতেন ড্রয়িংস্যার কাজেই চোখে না পড়ার কারণ ছিল না।

চক্ দেখেই আমাদের চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। কিছুদিন ধরে একটাও চক্ জুটোতে পারছিলাম না। ড্রয়িংস্যারের কাছে চক্ দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাবুল, নন্তু আর আমার মধ্যে ইশারা হয়ে গেল। স্কুলে ওই গ্লোব, ম্যাপ, চক্ নিয়ে যাবার আগেই কিছু সরিয়ে ফেলতে হবে আজ। নয়ত এমন সুযোগ আর জুটবে না।

তারপর স্কুল যাবার আগে সারাটা সকাল কতো ছুতোনাতা করেই না আমরা ড্রয়িংস্যারের ঘরে ঢুকলাম। কতো খোসামোদ আর তোষা-মোদ। 'স্যার, আপনার ঘরটা পরিষ্কার করে দি। ওখানটায় সব ডাঁই হয়ে রয়েছে—ঠিক করে দি স্যার। গ্লোবটা খুব সুন্দর—কতো দাম নিয়েছে স্যার?'

তা চেষ্টা-চরিত্র করে আমরা তিনজনেই মোটামুটি যা চক্ চুরি করলাম তাতে কারুর ভাগ্যেই দশটার কম চুমু পাওনা হয় না। হাবুলের তো কুড়িরও বেশি, বাইশ। ইস্—এতো আর কখনো হয় নি আমাদের।

সেদিন স্কুলে গিয়ে খালি মনে হচ্ছিল কখন চারটে বাজবে, ছুটি হবে, আমরা বই খাতাপত্র ফেলে অনুপমাদির কাছে যেতে পারব! অথচ সেদিন এক একটা পিরিয়ড যেন ভীষণ লম্বা মনে হচ্ছিল, শুরু হয় তো শেষ হতে চায় না।

যাক্, শেষ হল এক সময়। ছুটতে ছুটতে বোর্ডিং ফিরলাম। হাত পা ধুলাম না, টিফিন খেলাম না—দু' পকেটে চক্ নিয়ে মুঠোয় চেপে ধরে অনুপমাদির কাছে ছুটলাম।

অনুপমাদি বাগানে ছিল না। বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। পিসিমা বললেন, গা ধুতে গেছে। আমাদের আর তর সইছিল না। তবু বাগানে এসে দোলনায় দুলতে লাগলাম।

বড্ড দেরি করছিল অনুপমাদি। শীতের বিকেল চট্ করে ফুরিয়ে আসছিল। ছায়া বেশ ঘন হচ্ছিল এদিকে—আর আকাশ চুঁইয়ে আবীর গোলা জলের মতন শেষ রোদটুকু গাছের মাথায় কাঁপছিল।

অনুপমাদি তবু আসছে না। আ, কি যে করছে এখনো! আমরা ছটফট করছিলাম।

হ্যাঁ, অনুপমাদি এল। কী সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। মাথায় কেমন যেন জাল জড়ানো খোঁপা। লাল একটা শাড়ি পরেছে। চোখে কাজল। মুখে গলায় পাউডারের গুঁড়ো তখনও লেগে রয়েছে। আর গন্ধ। মিষ্টি গন্ধ। পায়ে চটি। আস্তে আস্তে ঘাসে পা টেনে টেনে অনুপমাদি আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

আমরা তিনজনেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে তৈরি হয়েছিলাম। উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারছিলাম না।

হাবুলই বললে প্রথমে, 'ইস্ কী সুন্দব তোমায় দেখাচ্ছে অনুপমাদি! কি করছিলে এতোক্ষণ—আমরা কতক্ষণ থেকে এসে বসে আছি। সাজ-গোজ করছিলে বুঝি!'

অনুপমাদি কিছু বলল না। সত্যি, এ-রকম সাজগোজ করে ফিটফাট হয়ে থাকতে অনুপমাদিকে আমরা খুব কমই দেখেছি।

আমাদের সুন্দর অনুপমাদির সাজ আর মুখ দেখতে দেখতে—আমরা তিনজনেই যে যার শার্ট কিংবা প্যাণ্টের পকেট থেকে মুঠো ভর্তি রঙীন চক্গুলো বের করে নিয়েছি কখন যেন।

হাবুলই প্রথমে হাতটা বাড়িয়ে দিল। খুব খুশী। তার গলা যেন খুশীর চোটে ফেটে পড়ছিল, 'এই নাও—আজ সব রঙীন চক্। আমার কিন্তু বাইশটা হবে।'

আমি হাত বাড়ালাম, 'আমারও সব রঙীন চক্, অনুপমাদি। ষোলটা আমার।'

নন্তু একটু অখুশী মুখে হাত বাড়াল। তারও অবশ্য সবই রঙীন চক্—কিন্তু ওর হিসেব দাঁড়িয়েছে মাত্র এগারো।

আশ্চর্য, অনুপমাদি কিন্তু আজ হাত বাড়িয়ে তার এত সাধের, এত লোভের রঙীন চক্‌গুলো নিল না। আমরা অবাক। বুঝতেই পারছিলাম না, অনুপমাদি কেন চক্‌গুলো নিচ্ছে না।

হাবুল বললে, 'কই নাও!'

আমিও হাতটা আরও একটু এগিয়ে দিলাম। নন্তু তো হাতে দিয়ে দেয় আর কি!

অনুপমাদি হঠাৎ হেসে উঠল। বেশ জোরেই। তারপর বললে, 'পাগল, চক্ নিয়ে আমি কি করব। তোদের কাছেই থাক্; তোরা খেলিস।'

আমরা তিনজনে হঠাৎ যেন চোখে ভীষণ একটা ঝাপসা মতন কিছু দেখতে পেলাম। শীতের বিকেলশেষের অন্ধকার না ঘন ছায়া না আর কিছু।

মনে মনে তিনজনে কোথায় যেন ছিটকে পড়লাম। বাইশ, ষোল আর এগারোটা চুমু!

কি যে বলব, কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

অনুপমাদি হঠাৎ বললে, বেশ একটু ধমকের গলায়, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন? পালা—! এক্ষুণি—' বলতে গিয়ে কথাটা জিবে আটকে নিল অনুপমাদি।

হ্যাঁ, তারপর আমরা—আমরা তিনবন্ধু চুপচাপ বাগান ছাড়িয়ে ফিরে চললাম। রাস্তার মুখে আসতেই দেখি জাম গাছটার তলা দিয়ে ড্রিল-স্যার অনুপমাদির বাড়ির ফটকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে আমরা একটু দেখলাম। হাবুল বললে, 'ড্রিল-স্যার!' তারপর তার মুঠোর মধ্যেকার রঙীন চক্‌গুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল বনতুলসীর ঝোপে। আমরা—আমি আর নন্তুও।

শীতের বিকেলে তিনজনে চুপচাপ ফিরতে শুরু করলাম। গাছ-পালার তলা দিয়ে, ঝাপসা চোখে।

আঙুরলতা | শূন্য

শূন্য

কার কথা দিয়ে শুরু করব বুঝে উঠতে পারছি না। মৈত্রসাহেবের কথা দিয়ে আরম্ভ করতে পারলে ভাল হত কিন্তু তাতে অনেকখানি পথ পিছু ফেলে যেতে হয়। ঘুরেফিরে এই পথটুকুর কথা আসবেই। মৈত্রসাহেবের কাছে আমি কেন গিয়েছিলাম, আমি কি চেয়েছিলাম তাঁর কাছে, কিসের যন্ত্রণা আমায় কলকাতা থেকে তাঁর কাছে মধ্যপ্রদেশের সেই পাহাড়ী শহরে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এ-সব কথা ত উঠবেই। কাজেই নিজের কথা দিয়ে শুরু করাই ভাল।

আমার নাম নিশীথ। এখন বয়স পঁয়ত্রিশ। কলকাতায় থাকি। বাড়িতে মা আছেন। বাবা মারা গেছেন অনেককাল। সহোদর এক বোন ছিল। বিয়ে হয়েছিল; ঠিক জানি না কি কারণে স্বামীর সঙ্গে তার বনে নি। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কটা সে ত্যাগ করেছিল। তারপর আমাদেরও। আত্মীয়স্বজন বলতে আর আছেন আমার কাকা। তিনি আলাদাভাবে থাকেন, অন্য বাড়িতে। আমাদের কাছে আসেন যান। আমাদের জন্যে তাঁর স্নেহ আছে কিন্তু কোনো আতিশয্য নেই। মৈত্র-সাহেব কাকার বন্ধু। কাকার কথামতনই আমি তাঁর কাছে গিয়ে-ছিলাম।

মৈত্রসাহেবের কাছে আমি কেন গিয়েছিলাম তা বলতে হলে আগের ক'টা কথা বলা দরকার। অবশ্য এ-কথা বলে রাখা ভাল, মৈত্রসাহেব ডাক্তার আর আমি রুগী, আমি গিয়েছিলাম নিজেকে দেখাতে, আমার রোগের কথা বলতে।

আমার মনে হয় না, যে-ব্যাধিতে আমি ভুগেছি সেটা নতুন কিছু। এমন নয় যে এ-রোগ আর কারুর হয় না। বরং আমার মনে হয়েছে, মানুষ মাত্রেরই, বিশেষ করে আমার মতন যাদের কপাল তাদের পক্ষে এ-রোগের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই।

ত্রিশ বছর যখন বয়স তখন থেকেই রোগটা দেখা দেয়। তার আগে মাঝে মাঝে উপসর্গ দেখা দিয়েছে। সে-সব আমি তেমন বুঝি নি,

বোঝার মতন আগ্রহও হয়ত ছিল না। ত্রিশ বছর বয়সে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, জীবনে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে যা ভুলে যাওয়া দরকার। এই ঘটনাগুলো এক একটা স্পর্শনীয় বস্তু নয়, এগুলো এমন নয় যে, নোঙরা বিশ্রী কিছু তোমার চোখের সামনে পড়ে আছে, হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে বা ফেলে দিলে—আর তারপর তোমার চোখের সামনে অস্বস্তিকর কিছু থাকবে না। জীবনের ধরনটা আলাদা, মনটাও অন্য-রকম কিছু। আমরা ত অনেক কিছু ভুলে যাই, ত্রিশ বছরের এই জীবনের সব কথা, সমস্ত কথা, প্রতিদিনের কথাই কি আমার মনে আছে? না, নেই। তার কোটি কথার বড় জোর দশটা কি বিশটা কথা আমার মনে আছে, বাকি সব কোন অতলে তলিয়ে গেছে। আমি জানি না, হাজার চেষ্টা করেও মনে করতে পারব না। হ্যাঁ, আমরা ভুলি—জীবনের অজস্র কথা ভুলে যাই। কিন্তু সেই সব অজস্র কথা তেমন নয় যে-গুলো মনে রাখার মতন। এরা মনে আঁচড় কাটতে পারে না, পারলেও তা এত সামান্য, এত ক্ষণিক যে একটি কি দু'টি দিনের বেশি তার আয়ু নেই। অথচ যে-সব কথা, যে-সব ঘটনা মনে আঁচড় কেটে গেছে গভীর-ভাবে তা ভোলা যায় না; কিছুতেই না। (যদি ভোলা যেত!)

ত্রিশ বছর বয়সে আমার মনে হয়েছিল জয়ন্তীর কথা আমায় ভুলে যেতেই হবে। না ভোলার কি আছে, জয়ন্তী সুন্দরী নয়, সে অসাধারণ কোনো মেয়ে নয়, তার এমন কোনো গুণ নেই যা আর কোথাও আর কখনো দেখা যাবে না। জয়ন্তীকে আমি ভোলবার চেষ্টা করেছি। আশ্চর্য, যত ভোলবার জন্যে ছটফট করেছি তত বেশি করে তাকে মনে পড়েছে। এক একসময় মনে হত ও আমার মনের মধ্যে ভূতের মতন সারাদিন সারারাত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কত সুন্দর সকাল, দুপুর আর নিরিবিলি ঘুমের রাত—আমি সুখী মনে নিশ্চিন্ত হয়ে কাটাতে পারতাম কত আরাম আর আয়েশ করে—কিন্তু পারি নি। পারি নি জয়ন্তীর জন্যে। তার কথা কোন সূত্রে কি ভাবে যে মনে এসে গেছে! আর জয়ন্তীর কথা মনে পড়ার অর্থই হল—নিজের জীবনের পাঁচটা বছরকে তন্ন তন্ন করে দেখা। অসংখ্য টুকরো টুকরো দৃশ্যকে নতুন করে চোখের সামনে টেনে আনা, অজস্র কথাকে কানের কাছে আবার করে বলানো, নিজের মনে বলা কথাগুলো আবার করে বলা। আর

শেষ পর্যন্ত এটা জেনে নেওয়া, মানুষ সৎ নয়, ভালবাসা কিছু না। হৃদয় এমন বস্তু যেখানে শিকড় গেড়ে কিছু বসে না। খুব সুন্দর নক্শা করা আয়না বৈ হৃদয় আর কি!

এ-কথা বলার দরকার করে না, জয়ন্তীর কথা ভাবতে আমার কষ্ট হত। কষ্ট হত বলেই তাকে আমি ভুলতে চাইতুম—কিন্তু পারতুম না।

মা আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন, পুরুষমানুষের পক্ষে এ-সব ছোটখাটো ব্যাপারে ভেঙে পড়া ভাল নয়। ও-সব কিছু না, যত প্রশ্রয় দেবে তত বাড়বে। একটা সামান্য জিনিস ভুলে যাওয়া এমন কি কঠিন! বিশেষ করে যখন সেই কথাটা ভেবে ভেবে শরীর মন খারাপ হতে বসেছে।

ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ, ছোটখাটো কি না আমি জানি না। হয়ত মা যা বলেছিলেন তাই ঠিক। কোনো মেয়েকে পাঁচ বছর ধরে ভালবাসাটা এমন কিছু নয়, খুবই সামান্য জিনিস। একটা মনোহারী কুকুর কি বেড়াল পোষা। তুলোট গায়ে হাত বুলনো। আর সেই আরামে খুশী হওয়া। আমি এই তুচ্ছ বিষয়টাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। বড় করে তুলছি। হয়ত সবই ঠিক—কিন্তু তবু আমি জয়ন্তীকে ভুলতে পারি নি, পারতুম না।

বছরখানেক পরে আমি বিয়ে করলাম। মা-র তাগিদ ছিল, কাকারও সেই রকম ইচ্ছে ছিল। আর আমার তরফ থেকে জয়ন্তীকে আমি বোধ হয় এইভাবেই ভুলতে চেয়েছিলাম। (মানুষ ভালবাসাও ভুলতে চায়!)

লতিকা সুন্দরী ছিল। নিজের স্ত্রী বলে অতিশয়োক্তি করছি না, বাস্তবিকই অসাধারণ সুন্দরী ছিল লতিকা। তার রূপে আগুনের আঁচ ছিল। হয়ত তাই শেষ পর্যন্ত আগুনও জ্বলেছিল। কিন্তু সে-কথা পরে। লতিকাকে বিয়ে করে আনার পর আমার মনে হয়েছিল জয়ন্তীকে আমি ভুলতে পারব। জলজ্যান্ত স্ত্রীর এত রূপ, এই দাহ, এই তীব্র উত্তেজনার কাছে—পাঁচ বছরের হাত-ধরাধরি ভালবাসার ছবিটা নিশ্চয়ই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের পর মাসখানেক আমি লতিকার ছায়াকে আমার ছায়া থেকে সরে থাকতে দিই নি।

তবু জয়ন্তীকে ভুলতে পারলুম না। বরং লতিকার পাশে শুয়ে জয়ন্তীকে আরো বেশি করে মনে পড়ত। কেন পড়ত জানি না।

লতিকার কিছু অগোচরে ছিল না। সে জানত, সব কথাই জানত। আমার সব কথা লতিকা জেনেছিল, কিন্তু আমিই তার কথা জানতুম না। পরে জানলুম।

পাঁজি পুঁথিতে আমার বিশ্বাস কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়সটা আমার যে-ভাবে গেছে তাতে মনে হয়, সবরকম দুষ্ট গ্রহ এই সময়টায় আমার দিকে শকুনিচোখে তাকিয়েছিল। যেন দেখছিল আমার কি হয়, আমি কি করি। আমি কিছুই করি নি। চুপচাপ শুধু দেখছিলুম। নীরব দর্শকের ভূমিকা। জীবনের আর একটা ভূমিকা। সকলকেই এ-ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। না করে উপায় কি! মাত্র পাঁচটা মাস বেঁচে থেকে ছেলেটা মরে গেল। খুব সুন্দর দেখতে হয়েছিল খোকা। লতিকার মতন গায়ের রঙ পেয়েছিল, তারই মতন ঠোঁট গাল, আর আমার মতন চোখ নাক চুল। খোকা এক শীতেব সকালে মরে গেল। আশ্চর্য! কি সহজেই মানুষ মরে যায়! আর তারপর এক বর্ষার শুরুতে লতিকা পালিয়ে গেল। লতিকার কথা আমি জানতুম না, আমার কথা লতিকা জানত। আমি জানতুম না লতিকার পছন্দকরা এক মানুষ আছে, যে-মানুষ চমৎকার 'রাইড' করতে পারে, রাইফেল চালাতে পারে। এই মানুষটি আগে থাকতেই ছিল। মাঝে পড়ে বিয়েটা আমার সঙ্গে হয়ে গিয়েছিল। এটা একটা ভুল। অনেক মারাত্মক ভুল জীবনে হয়, বুঝে না-বুঝে। লতিকা তার আমার ভুলটা এইবার শুধরে নিল বোধ হয়। লতিকা পালিয়ে যাবার পর আমার মনে হয়েছে ছেলেটা কার ছিল? আমারই ত! যারই হোক, সে-কথার আজ আর দরকার নেই। সেই শিশু ত কবেই নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। আমি তাকে খুব ভালবেসেছিলুম, পাঁচ-মাসের ওই শিশুকে। খোকাকে আমার খুব ভাল লাগত।

কিন্তু তাতে কি! জয়ন্তী তার বাইশ বছরের জীবন আর মন দিয়ে বুঝতে পারে নি আমি তাকে কত ভালবাসতুম, পাঁচ মাসের শিশু কি করে বুঝবে! ওরা সব একে একে সরে যাচ্ছিল—ঃ জয়ন্তী, খোকা, লতিকা। শেষ পর্যন্ত আভা—আমার বোন আভা সেও। আভা আত্মহত্যা করল। কেন করল আমি জানি না। স্বামীর সঙ্গে তার বনিবনা না হলেও আমাদের বাড়িতে অন্তত তার কোনো কষ্ট হয় নি; কোনো অসুবিধে ছিল না। তবু সে আত্মহত্যা করল। তার মনের কথা আমি

জানি না, তার দুঃখ আমার বোঝার বাইরে। আত্মহত্যা কী ভীষণ! আভার আফিং খেয়ে মরার সেই চেহারা আমি ভুলতে পারি না।

অথচ এ-সবই আমি ভুলতে চাইছিলুম—। ভুলতে চাইছিলুম জয়ন্তীকে, খোকাকে, লতিকাকে, আভাকে। ভুলতে পারছিলুম না। আমার মন যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। শরীরও। মা প্রায় পাগল হয়ে যেতে বসেছিলেন। তছনছ হয়ে যাওয়া এই সংসারটা আর তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। বিশেষ করে আমার জন্যে, যখন আর কেউ নেই তাঁর, এক আমি—তখন আমার জন্যে, তাঁর ছেলের জন্যে মা যে কী অসহ উদ্বেগ আর আশংকায় এবং দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন তা অনুমান করা কঠিন নয়।

আমি চেষ্টা করেছিলুম এ-সব ভুলে যেতে। জানতুম না কি করে ভুলে যাওয়া যায়! বন্ধু যোগাড় করে মদ খেয়েছি, রেসের মাঠে গিয়েছি, কখনো সখনো বেশ্যাবাড়িতে। এ-সব জিনিস এমন কিছু নয় যাতে ভালবাসার কথা ভোলা যায়, পালিয়ে যাওয়া সুন্দরী বউয়ের কথা ভোলা যায়, ভোলা যায় একটি সুন্দর সন্তানের কথা, বেচারী আভার সেই আফিং খেয়ে মরা মুখটা। আমি অন্তত ভুলতে পারি নি। আমার কোনো লাভ হয় নি। বরং লোকসানই হয়েছে। মদে, রেসে, বেশ্যাবাড়িতে—কিছু টাকা গেছে, পৈত্রিক অর্থ। আর শেষে এই সূত্রে আলাপ হওয়া এক বন্ধু নিরঞ্জন চক্রবর্তীকে যে হাজার আষ্টেক টাকা দিয়েছিলুম ফাটকা বাজি করতে—তাও জলে গেল। ও আমার সঙ্গে জোচ্চুরী করল।

সব ছেড়ে দিয়ে এবার ঘরকে আশ্রয় করলুম। কিন্তু কই, এই ঘরও তো আমার জীবনের ক'টা বছরকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে পারল না। মা-র ইচ্ছে ছিল আমি পুজো আর্চা করি। এতে নাকি মন ভাল হয়, মানুষ দুঃখ কষ্টকে ভুলতে পারে। কিছুদিন আমি সে-চেষ্টাও করেছি। পট সামনে রেখে মূর্তি ধ্যান করবার জন্যে চোখ বন্ধ করে বসেছি—ঘরে অনেক সুগন্ধি ধূপ জেবলেছি, ধুনো দিয়েছি। কিন্তু পটের আড়াল থেকে জয়ন্তী আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত, ধুনোর ধোঁয়ার রেখাগুলো উড়ে উড়ে খোকার অস্পষ্ট একটি অবয়ব তৈরি করত, লতিকা আমার মনের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়াত, দেখতে পেতাম আভাকে, তার কথা শুনতে পেতাম।

ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস ছিল না, মঠে মাঠে আস্থা ছিল না—তবু ক'টা দিন মা-র কথায় একটা অর্থহীন ক্রিয়া করা গেল। শেষে ছেড়ে দিলাম।

শরীর আমার আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। খুব খারাপ। আয়নায় নিজের চেহারা দেখলেই সেটা বুঝতে পারতাম। মন আমার ভীষণ অন্যমনস্ক থাকত, কোনো কথা ভাল বুঝতাম না, কারুর কথা শোনার মতন ধৈর্যও থাকত না। আমার ঘুম ছিল না। সারা রাত ভরে ভাঙা ভাঙা তন্দ্রা ছিল। আর সেই তন্দ্রার গায়ে গায়ে দুঃস্বপ্ন। সেই জয়ন্তী, লতিকা, খোকা, আভা।

বাড়িতে ডাক্তার আসত। মা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। কাকাও উদ্বেগ অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। প্রায়ই তাই নতুন নতুন ডাক্তার আসত। তারা নাড়ি দেখত, বুক দেখত। টাকা নিত, ওষুধ দিত।

মা বলতেন, নিশীথ তুই যে পাগল হয়ে যাবি। মনটা একটু শক্ত কর। কত লোকের কত কিছু যায়, তা বলে কি তারা এমনভাবে ভেঙে পড়ে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ—স্বামী গেছে, মেয়ে গেল, ছেলের বউ. নাতি। তবু তো আমি দাঁড়িয়ে আছি!

সত্যি মা দাঁড়িয়েছিলেন। কি করে কেমন করে তিনি শক্ত হয়ে আছেন আমি বুঝতে পারতুম না। তবু মাকে আমি বলেছি, 'লতিকাকে কি তুমি ভুলতে পেরেছ মা? ঠিক করে বল!'

আমি জানতুম মা জবাব দেবেন না। লতিকা যদি মরে যেত, আত্ম-হত্যা করত—স্বামী এবং মেয়ের মতন মা তাকে ভুলতে পারতেন। মৃতকে ভোলা সহজ। মৃতের সঙ্গে আমি জড়িয়ে থাকি না। কিন্তু লতিকার সঙ্গে এ-সংসারের সম্ভ্রম, মর্যাদা, গৌরব—অনেক কিছুই জড়িয়েছিল, মা যার অংশীদার। নিজের অংশের এই নিলাম মার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। লতিকাকে মা তাই কিছুতেই ভুলতে পারতেন না।

আমি কাউকেই ভুলতে পারতাম না। জয়ন্তী, লতিকা, আভা, খোকা—এদের সবার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক কিছু জড়িয়ে ছিল। বিশ্বাস, ভালবাসা, সততা, মর্যাদা, স্নেহ—এ-সবই যে জড়িয়ে ছিল। কি করে আমি ভুলব!

আমার কথা কাউকে বোঝাবার নয়। নিজের কথা নিজেকেই ভাবতে হত। নিজেকেই শুধোতে হত। আমি যা বিশ্বাস করে এসেছি ছেলে-বেলা থেকে, ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি—দেখতাম তার সবই প্রায় আতস-বাজির ফুলের মতন। ওরা এক একটি চোখ ভোলানো স্বপ্ন। মুহূর্তের মোহ। সত্য নয়, চিরকালের জন্যে নয়, সুন্দর নয়।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। কাকা এক ডাকসাইটে ডাক্তার এনে হাজির করেছিলেন। ভদ্রলোক আমায় প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার অসুবিধে কি? মানে কম্‌প্লেনটা কিসের?'

জবাবে আমি আমার কপাল দেখিয়ে বলেছিলাম, 'মাথায়।'

'কি কষ্ট হয়?'

'তা বলতে পারব না।'

'স্ট্রেঞ্জ...কি না হলে আপনার মনে হবে আপনার আর কষ্ট নেই?'

'শুধু যদি পাঁচ ছ' বছরের কথা আমি ভুলতে পারি—যদি এই ক' বছরের স্মৃতি বলে আমার কিছু না থাকে...!'

আমার কথায় ভদ্রলোক বোধ হয় খুবই অবাক হয়েছিলেন। একটু সময় আর কথা বলতে পারেন নি। তারপর আস্তে আস্তে কাকাকে বলেছিলেন, 'দিস ম্যান্‌ ওয়ান্টস টু ড্রপ এ পোরশান অফ হিজ মেমারি!' তার পর আমার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলেছিলেন, 'আপনি যদি একটা হাত কি পা কেটে বাদ দেবার কথা বলতেন বুঝতাম, বোঝা সম্ভব ছিল—এবং সেটা করাও অসাধ্য ছিল না। কিন্তু ডোন্ট মাইন্ড, আমি জানি না—আমি শুনি নি, স্মৃতিকে কি ভেবে চাকলা করে কেটে সরিয়ে ফেলা যায়!'

এর পরই, খুব সম্ভব সেই ডাক্তার ভদ্রলোকের কথায় কাকা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন আমার আর পাগল হতে বেশি দেরি নেই। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা দরকার। আমাকে সুস্থ করে তোলার শেষ চেষ্টা আর কি।

পুরনো বন্ধু মৈত্রসাহেবকে কাকার মনে পড়ল। প্রায় বছর বিশ আর্মিতে সাজনাগার করে এখন স্বদেশে ফিরে এসে নির্জনে এবং নিভৃতে জীবন কাটাচ্ছেন। কাকা তার বন্ধুর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা থেকে বুঝতে পারলুম—মৈত্রসাহেব বিচক্ষণ লোক। সারভিসে থাকার সময় কয়েক শ' 'হেড্‌ ইনজিউরি' কেস হাতে কলমে ঘেঁটেছেন। তারপর

সারভিস থেকে সরে এসে ও-দেশের বড় বড় হাসপাতালে মানুষের মাথা নিয়ে নিজের মাথা ঘাটিয়েছেন কয়েক বছর। অবশেষে. কী খেয়াল হল—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে এলেন স্বদেশে। 'বাংলা দেশে স্বাস্থ্য পোষাবে না, কলকাতা ভল লাগে না—। সিটি লাইফ আর নয়; একটু ঠাণ্ডা নিরিবিলি নির্জন জায়গায় থাকতে চাই, বুঝলে কুমুদশংকর। সি পি-র এই জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে। একটা বাংলো বাড়ি কিনেছি। খাসা আছি।'—মৈত্র সাহেব কাকাকে লিখেছিলেন।

মৈত্র সাহেবের সঙ্গে কাকার চিঠি লেখালেখি শেষ হল। মার সঙ্গে আলোচনা। শেষে কাকা বললেন আমাকে, 'তুমি একবার ওঁর কাছে যাও। অভিজ্ঞ লোক, খুব সুন্দর মানুষ। উনি তোমার কিছু করতে পারবেন। জায়গাটাও ভাল—, কিছুদিন বেড়িয়ে আসতে পারবে। ভাল লাগবে তোমার।'

আপত্তি করার, অরাজী হবার কিছু ছিল না। আমি পাগল হয়ে যাই. কি মরে যাই—এ আমি চাই নি। বাঁচতেই চেয়েছি আমি। খালি বুঝতে পারছিলাম না, কি করে বাঁচব—জীবনের কতকগুলো অস্বস্তি-কর, যন্ত্রণাদায়ক দিনের কথা ভুলে গিয়ে কি করে আবার বাঁচতে পারি!

মৈত্রসাহেবের কথা

কুমুদশঙ্করের ভাইপো নিশীথ দিনকয়েক হল এখানে এসেছে। ওর সমস্ত কথা আমি শুনেছি। ছেলেটির বয়স অল্প। এই বয়সেই বেচারীকে পরপর কয়েকটা বড় রকম দুঃখের আঘাত পেতে হয়েছে। খুব নরম ধাতের মানুষ হলে যা হয়—নিশীথেরও দেখছি তাই—দুঃখ আঘাতগুলো মনে বড় বেশি করে বেজেছে। ছেলেটি মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙে পড়েছে।

এক ধরনের মানুষ আছে যাদের কতকগুলো শব্দের ওপর অস্বা-ভাবিক একটা টান আছে। আমি যদিও 'শব্দ' কথাটা ব্যবহার করছি —কিন্তু আসলে এ-গুলো শব্দ নয়—শব্দের মধ্যেকার আইডিয়া। যেমন ধরা যাক 'পেট্রিয়টিজম্' শব্দটা। বাঙলায় বলে স্বদেশপ্রীতি। এই শব্দ তা ইংরিজী হোক, কি বাঙলা, কি অন্যকিছু—এর মধ্যে এমন একটা আইডিয়া আছে যা বেশির ভাগ মানুষই যতটা না-বোঝে তার চেয়ে

ঢের বেশি ভালবাসে। এ-রকম কিছু কিছু শব্দ আছে—যার অর্থ আমরা বুঝি না-বুঝি, তার সম্পর্কে আমাদের ধারণা কম থাক বেশি থাক—যায় আসে না, সব সময় তার একটা বড়রকম মূল্য দিয়ে থাকি। ভালবাসা, বন্ধুত্ব, পবিত্রতা—এ-সব হচ্ছে তেমন শব্দ। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এই কথাগুলো এক একটি সম্পদ।

নিশীথ, আমার দৃঢ় ধারণা—এইরকম কতকগুলো শব্দকে খুবই মূল্য দিয়েছিল। ভালবাসা, সততা, স্নেহ, দাম্পত্যজীবন—এইসব ছোট ছোট চার কি পাঁচ অক্ষরের শব্দগুলোর মধ্যে যে-ধারণাগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু ছোট নয়। এরা প্রত্যেকেই এক একটা জগৎ। এবং বিভিন্ন মানুষের মনে এ-জগৎ বিভিন্ন আকারের। কারুর ছোট, কারুর বড়। নিশীথের মনে এরা বড় জীবন্ত, বড় মোহময়। অল্পদিনের মধ্যে পর পর কয়েকটা ভীষণ রকমের আঘাত পেয়ে তার সেইসব বহুদিনেব গড়া জগৎগুলো ছত্রাকার হয়ে ভেঙে পড়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া তার কষ্ট দুঃখ হতাশা অনুভব করার উপায় নেই। অনুমান করা চলে মাত্র।

নিশীথ তার জীবনের এই পাঁচ সাতটা বছরের কথা ভুলতে চায়। স্মৃতির একটা অংশ।

নিশীথকে আমি 'মেমারি' নামের আশ্চর্য বিষয়টার কথা বার কয়েকই বোঝাবার চেষ্টা করেছি। 'মেমারি'র ফিজিয়লজি ওর পক্ষে বোঝা সহজ নয়। তবু সহজ করে একটা ধারণা মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছি। স্টিমুলাস, সেন্স অর্গান, নার্ভাস ইম্‌পাল্‌সেস্‌, ব্রেন, নিউরোনস—এ-সব কঠিন কঠিন কথার আড়ালে সরল যে ব্যাখা হতে পারে নিশীথকে বোঝাতে হয়েছে। তারপর ওকে বুঝিয়েছি কি অবস্থায় ঘটনাগুলো স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকে, আর কখন থাকে না। এ-বিষয়টা কঠিন নয়। নিশীথ বুঝতে পারল।

এই বিষয়টা বোঝাতে গিয়ে আমি ইচ্ছে করেই আমার খুব প্রিয় একটা প্রসঙ্গ টেনে আনলাম। নিশীথকে আমি বলেছিলাম, বুঝলে নিশীথ, ভবিষ্যতটা সব সময় বর্তমানের ওপর নির্ভর করে—আর বর্তমান অতীতের ওপর। এরা বিচ্ছিন্ন নয়, বিচ্ছিন্ন হতেই পারে না। তোমাকে আমি রিটেনটিভনেসের কথা বলেছি। জীবনের এটা হচ্ছে আদি সত্য। সব রকম প্রাণের বৃদ্ধির প্রথম কথাই হচ্ছে ধারাবাহিকতা

বজায় রাখা। অতীতের অনেক জিনিস তুমি বর্তমান পর্যন্ত টেনে আন। বতর্মানে এসে এই অতীত নষ্ট হয়ে যায় না, বর্তমানে রূপান্তর নেয়। তেমনি অতীতও এই বর্তমানেরই রূপান্তর। একটা নদীর সঙ্গে এর তুলনা করতে পার। এক এক জায়গায় এক এক নাম —কিন্তু সেই একই জলস্রোত। তেমনি হচ্ছে স্মৃতি। স্মৃতির মধ্যে প্রথম আছে সঞ্চয়ের কথা, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়—। সব সঞ্চয় নয়—তেমন সঞ্চয় যা ভালভাবে ছাপ ফেলে গেছে। ছাপ যত গভীর হবে তত বেশি তার আয়ু। তারপর হচ্ছে পারিপার্শ্বিকের শক্তি। আমার ঠাকুমাকে আমার মনে নেই, খুব বাচ্চা তখন, কিন্তু সেই রাতটার কথা আমার এখনো মনে আছে। দেশের বাড়ি, প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি—এক একটা বাজ পড়ছিল যেন আমাদের বাড়ি বাগান সমস্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আর সে কি ঝড়ের শব্দ! তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। ভয়ে আমরা তিনটি ভাই-বোন জড়াজড়ি করে চোখ বন্ধ করে বসেছিলাম। ঠাকুরমাকে মনে নেই, মুখও মনে পড়ে না—কিন্তু ঠাকুমার কথা মনে পড়লে সেই রাতটার কথা মনে পড়ে। আর খুব দুর্যোগের রাতে সেই দিনটার, সেই সঙ্গে ঠাকুমার মরার কথা মনে পড়ে। কিন্তু ও-সব কথা থাক্—যা বলছিলাম। তুমি কোনো মেয়ের শঠতা, কারুর অসততা, আঘাত, স্ত্রীর ছলনা, অপরাধ—অর্থাৎ মানুষের এই নোংরামিগুলো ভুলতে চাও। কিন্তু তা তো হবার নয়। এ পৃথিবী এইরকম। আমার এক বিদেশী বন্ধু বলত, মানুষ যদি যুগ থেকে যুগে—বংশ থেকে বংশপরাক্রমে তাদের পাপগুলো সন্তান-সন্ততির ঘাড়ে—এক রক্ত থেকে অন্য রক্তে চালান করে না দিয়ে যেত তা হলে আমরা অন্যরকম হতুম। এ পৃথিবীর অন্য রূপ হত। কথাটা খুব বাজে কথা নয়, আমি যদি না জানতুম হিংসে কি, না জানতুম কি করে ছোরা মারতে হয়, বন্দুক চালাতে হয়—যদি আমায় না শেখান হত, জোচ্চুরী কর, মিথ্যে কথা বল, পরস্ত্রী সম্ভোগ কর, অন্যকে ঘৃণা কর—তবে, নিশীথ ভেবে দেখ আমি কেমন হতুম। মানুষ কেমন হত—এ পৃথিবী কেমন হত। পাপ আকাশ থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে নি। এরও চাষ করতে হয়েছে। এখন আর কোনো উপায় নেই। মানুষকে আর তুমি শোধরাতে পারবে না, সে আশা কম। Mneme...এ হচ্ছে রক্তে গচ্ছিত রাখা পৈত্রিক মূলধন। তুমি আমি তার অভিশাপ থেকে পালিয়ে যেতে পারব না।

...মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হয়—এত মাথা ঘাঁটলুম—এত দেখলুম, যদি জানতুম, যদি কোনভাবে ধরতে পারতুম স্মৃতিকেন্দ্রের কোথায় এই পাপ যুগ থেকে যুগে জমা থাকে—তবে সেই জায়গাটুকু অসাড় করে কেটে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখতুম মানুষ কি, সে কেমন, সে কি করে!

আমি বেশ একটু ভাবালু হয়ে উঠেছিলাম। নিশীথ তার শ্রান্ত, ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়েছিল। আস্তে আস্তে তার চোখের দৃষ্টি বদলে যাচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে খুব চঞ্চল আর বিচলিত হয়েছে। উত্তেজনা বাড়ছিল ওর।

হঠাৎ নিশীথ আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। বললে, 'কাকাবাবু, আমার ওপর একবার চেষ্টা করে দেখুন।'

'তোমার ওপর?'

'হ্যাঁ। ক্ষতি কি! আমি ত মরব না। অন্যভাবে বাঁচব, অন্য মানুষ হয়ে।'

'পাগল নাকি তুমি, নিশীথ?'

নিশীথ খুব হতাশ হয়ে পড়ল। খানিক পরে বললে, 'আমি জানি এ-ভাবে, এই মন নিয়ে, লতিকাদের স্মৃতি নিয়ে আমি সুস্থ মানুষের মতন বেঁচে থাকতে পারব না। হয়ত পাগল হয়ে যাব, না হয় আত্মহত্যা করব। আপনি চেষ্টা করলে আমায় হয়ত বাঁচাতে পারতেন। আপনি তা করবেন না।' নিশীথের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

নিশীথকে আমি সব কথা কি করে বোঝাই। আমি কি পারি না-পারি তা ওকে আমি কেমন করে বিশ্বাস করাবো। আমি নিশীথের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলুম।

হঠাৎ.. হঠাৎ মনে হল...

'তুমি তোমার মাকে ভালবাস নিশীথ?'

'বাসি।' নিশীথ মাথা নাড়ল।

'তোমার কাকাবাবুকে?'

'শ্রদ্ধা করি খুব।'

'আর কি কি ভালবাস তুমি, মানে কি কি তোমার ভাল লাগে?'

'সে তো অনেক কিছুই আছে।'

'তবু বল দু-চারটে, শুনি।'

'আমি পাখি ভালবাসি, ফুল, গান, ছবি, কোনো কোনো বই, ছেলে-

বেলার কোনো কোনো বন্ধুকে...

'থাক্, বুঝতে পারছি।' আমি চুপ করলাম।

খানিকটা চুপচাপ। তারপর হঠাৎ নিশীথের চোখে চোখ রেখে বললাম, 'একটা কাজ আমি পারি নিশীথ, আমার ক্ষমতায় কুলোবে। আমি তোমার গোটা স্মৃতিকেই নষ্ট করে দিতে পারি—ফর সাম আওয়ার্স—কয়েক ঘণ্টার জন্যে—আট দশ বার—বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা। তুমি যদি সে-অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাও—'

'আমি রাজী।'

'ভেবে দেখ ভাল করে।'

'ভাববার কিছু নেই, কাকাবাবু। আমি রাজী, এখুনি।'

'তোমার ভয় হচ্ছে না—?'

'ভয়, কেন—?'

কথাটা বলে ফেলতে যাচ্ছিলাম আর একটু হলেই। তাড়াতাড়ি সামলে নিলুম। হেসে বললুম, 'বেশ, আজ রাত্রে শোবার আগে একটা ওষুধ দেব খেয়ে নিও। তারপর যা করার করব।'

নিশীথ মাথা নাড়ল।

আমার কথা

সকালে ঘুম থেকে উঠলুম যখন, অনেক বেলা হয়েছে। মাথাটা কেমন ধরা ধরা লাগছিল। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি বলেই হয়ত। মনে পড়ল মৈত্রসাহেবের ওষুধ খেয়ে কাল ঘুমিয়েছিলুম। আজ তিনি আরও সব কি কি করবেন। কখন করবেন জানি না। কি ভাবে করবেন তাও জানি না। মাথাটা বড় ধরা ধরা লাগছে। খুব খিদে পেয়েছে। স্নান করতে ইচ্ছে করছে। জল তেষ্টাও পেয়েছে। আমি কি স্নান করব?

দরজা খুলে বাইরে এলুম। মৈত্রসাহেব বাংলোর ব্যারান্দায় পায়-চারি করছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

'ঘুম ভাঙলো?' মৈত্রসাহেব হাসিমুখে বললেন।

'হ্যাঁ। মাথাটা কেমন ধরা ধরা লাগছে। স্নান করে আসব?'

'নিশ্চয়। যাও, স্নান সেরে এসো। আমি খাওয়ার ঘরে থাকব।'

স্নান করার পর শরীরটা খুব ভাল লাগছিল। মাথাটা খুব হাল্কা মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ যেন আমার চোখে ঘুমের মত কিছু জড়িয়ে ছিল, সবই কেমন আবছা অস্পষ্ট—। স্নানের পর দৃষ্টিটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাইরের রোদ, সবুজ কাঁচের জানলা, হালকা নীল পর্দা-গুলো এবার খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মৈত্রসাহেব ডাইনিং টেবিলের সামনে বসে ছিলেন। সামনে কতক-গুলো লেখা কাগজ। ক্লিপ দিয়ে গাঁথা।

আমি টেবিলে এসে বসতে মৈত্রসাহেব চা ঢালতে শুরু করলেন। ইশারায় রুটি মাখন ডিম কলার প্লেটটা তুলে নিয়ে খেতে বললেন।

খিদে পেয়েছিল খুব। কোনো কথা না বলে আমি খেতে লাগলাম। আর মাঝে মাঝে মৈত্রসাহেবের দিকে তাকিয়ে ভাববার চেষ্টা করছিলাম, কখন উনি আমায় ওষুধ-পত্র ইনজেকশনের সেই ঘরটাতে ডেকে নিয়ে যাবেন, কি হবে তারপর, কি হওয়া সম্ভব।

কয়েক চুমুক চা খেয়ে মৈত্রসাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। তাকা-লেন আমার দিকে। আমি তখন ডিমটা শেষ করে সবে চায়ে ঠোঁট ঠেকিয়েছি। মৈত্রসাহেব একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বড় সুন্দর শান্ত হাসি হেসে বললেন, 'তারপর—বলো কেমন আছ?'

'ভালো।' আমি মৈত্রসাহেবের কথাটা বুঝলাম। 'মাথা ধরার ভাবটা আর নেই।'

'না থাকারই কথা।' মৈত্রসাহেব আর এক চুমুক চা খেলেন।

চায়ের পেয়ালা থেকে মুখ তুলে আমি বললাম, 'কখন শুরু করবেন?'

'কিসের শুরু?'

আমি অবাক। মৈত্রসাহেব কি কালকের কথা ভুলে গেলেন। না কি মন বদলে ফেলেছেন। বললাম, 'আমার স্মৃতিকে কিছুক্ষণের জন্যে —কয়েক ঘণ্টার মত নষ্ট'—

'সে তো হয়ে গেছে। আই ডিড্ ইট্।' মৈত্রসাহেব আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালেন।

হয়ে গেছে? কখন হল? কেমন করে হল? কই আমি তো কিছুই জানতে পারলাম না।

আমার বিস্ময়, অবিশ্বাস, সন্দেহ এত ভাল করে চোখে মুখে ফুটে

উঠল যে মৈত্রসাহেবকে সেটা আর মুখে বলার দরকার করল না, তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন।

দেওয়ালের ক্যালেন্ডারটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন মৈত্রসাহেব, তারপর পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে সীল-মোহরের ছাপটা আমায় দেখতে দিলেন।

'আজ ১৬ তারিখ। ১৪ই রাত্রে তুমি ঘুমোতে গিয়েছিলে। মাঝের একটা দিন তুমি কোথায় ফেলে এলে নিশীথ?'

আমি চমকে উঠলাম। এ-রকম ভাবে জীবনে বোধ হয় আর কখনও চমকে উঠি নি। কোথা থেকে একটা দুরন্ত ভয় লাফিয়ে আমার বুকে এসে পড়ল। আর সে-ভয় কী ভীষণ, কী চঞ্চল! বুক থেকে লাফিয়ে আমার হৃদপিন্ড চেপে ধরল, তারপর গলা। নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম, আমার সমস্ত শরীর যেন বরফের জলে ডুবনো রয়েছে। এত ঠান্ডা, এত অসাড়।

মৈত্রসাহেব নিশ্চয়ই সব লক্ষ্য করছিলেন। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, 'কি হল? অসুস্থ বোধ করছ? গরম দুধ খাবে খানিকটা?'

ধীরে ধীরে চেষ্টা করে ভয়টা আমি কাটিয়ে উঠলাম। তাকালাম মৈত্রসাহেবের দিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। কি দেখছিলাম তাঁর মুখে জানি না। যেন নিজেকে দেখছিলাম। আমি বেঁচে আছি—এই বোধ আর বিশ্বাসটা যেন নতুন করে অনুভব করছিলাম।

'কাকাবাবু!'

'বলো।'

'আমি কি কাল বেঁচে ছিলাম?'

'তার মানে!—বেঁচে ছিলে বৈকি!'

'আমার কি জ্ঞান ছিল?'

'অফকোর্স!'

'তাহলে এ কি হল। একটা পুরো দিন আমি কি করলুম, কোন কথা বললুম, কাকে দেখলুম—কিছুই জানলাম না। মরার চেয়ে এই বাঁচার তফাৎ কি?'

মৈত্রসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে তেমনি সুন্দর শান্ত চোখে আবার হাসলেন। ক্লিপ্ দিয়ে আঁটা কাগজগুলো তুলে নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। খুব মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় বললেন, 'এই কাগজগুলো

পড়। এর মধ্যে সব লেখা আছে। যে-দিনটির কথা তুমি মনে করতে পারছ না—এই কাগজে সে-দিনের সমস্ত কথা লেখা আছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তুমি কি করেছ, কোথায় গেছ।'

মৈত্রসাহেব লিখে রেখেছেন—কলমের আঁচড়ে। প্রথম পাতাটা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম। আমার বুকের মধ্যে আবার সেই ভয়টা ছুটে এল। নিশ্বাস ভারি হয়ে আসছিল। দ্বিতীয় পাতাটা কেমন একটু অন্যমনস্ক ভয় ভয় ভাবে পড়তে লাগলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমার মধ্যে বিশ্রী এক অস্বস্তি জমে উঠেছে, খুব বিচলিত হয়ে পড়েছি এবং বিহ্বলতা আমায় শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। আমার হাত ঘামছিল, কপাল, গলা, বুক। আঙুলগুলো যেন নীল হয়ে আসছিল।...দ্বিতীয় পাতাটা শেষ করার পর—তৃতীয় পাতায় এলাম। দু-চারটে লাইন হয়ত পড়েছি—আমার সমস্ত শরীরটা যেন হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল...কি মনে হচ্ছিল বলতে পারব না, বোঝাতে পারব না। শুধু হাতের কাগজগুলোকে তাল করে পাকিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে দিলাম যেন হাতের ওপর এতক্ষণ আমার অজান্তে একটা নোঙরা, বিষাক্ত, কিলবিলে, কুৎসিত সাপ জটলা পাকিয়ে পড়েছিল। চমকে উঠে, ভয়ে, ভীষণভাবে একটা ভীতার্ত চিৎকার করে ছুঁড়ে দিয়েছি।

তারপর আমি কেঁদেছি। হয়ত অনেকক্ষণ ধরে। মৈত্রসাহেব কখন উঠে বাইরে চলে গেছেন। একটিও কথা না বলে।

আমার কান্নাও থামল। ঘরটা নিস্তব্ধ। ওয়াল-ক্লকটা টিক্ টিক্ করে বেজে চলেছে। আমি ঘড়িটা দেখলাম। মনে হল, ওই ঘড়িটার টিক্ টিক্ এখন বন্ধ হয়ে গেলে যেমন হবে—আমার তেমনি হয়েছিল কাল। আমি ছিলাম, কিন্তু সে-থাকা একটা বন্ধ ঘড়ির মতন।

ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। মৈত্রসাহেব বাগানের রোদে ফুল-গাছের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ওই বাগান আমায় টানছিল, ওই সুন্দর রোদ, মৈত্রসাহেবের সুঠাম দেহ, তাঁর পোশাক। একটা কাক ডাকছিল, ক'টি চড়ুই উড়ছিল, দেবদারু গাছের পাশ দিয়ে নীল আকাশটা উঁকি দিচ্ছিল। একটি মেয়ে বাইসিকল চেপে রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

আমি জানি না, পা পা করে কখন বাগানে মৈত্রসাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

মৈত্রসাহেব একটা হলুদ গোলাপ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এটা কি ফুল বলতে পার?' বলে হাসলেন।

'গোলাপ।' আমিও হাসলুম।

'আজ পারলে, কাল কিন্তু পার নি।'

সত্যিই পারি নি। কাল আমি কিছুই চিনতে পারি নি! ঘাস, পাখি, ফুল, নদী, মানুষ, রাস্তাঘাট, রঙ, আকাশ, মাটি—কিছুই না। এ-জগতের কোনো জিনিস আমার চেনা ছিল না। আমার মুখে কথা ছিল না, কারণ ভাষা আমার জানা ছিল না। আমি জানতাম না, আগুন কি, আগুন কেমন? আমি বুঝতে পারি নি...না, কিছুই পারি নি। আমার এতো চেনা জগৎ একেবারেই অজানা, অচেনা হয়ে গিয়েছিল। কী সাঙ্ঘাতিক!

মৈত্রসাহেব গোলাপফুলটা ছিঁড়ে আমার হাতে দিলেন। বললেন, 'নিশীথ, তুমি কি স্মৃতিকে সত্যিই নষ্ট করতে চাও? মেমারি অ্যান্ড ইমেজ্...'

'আমি আর কিছু চাই না, কাকাবাবু। এই কষ্ট অনেক ভাল।'

'ইয়েস। এ-কষ্ট অনেক ভাল। তবু আবার করে শিশু হওয়া যায় না।'

মরশুমী ফুলের ঝোপটা পেরুতে পেরুতে মৈত্রসাহেব আবার বললেন, 'তুমি যেন সত্যিই ভেব না—আমি তোমার স্মৃতিকে নষ্ট করে দিয়েছিলাম একটা দিনের জন্যে! না, সে-ক্ষমতা আমার নেই। হয়ত কারুরই নেই এখন পর্যন্ত। আমি শুধু তোমায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলুম গোটা একটা দিন। তবে কাগজে আমি যা লিখেছিলাম সেটা কল্পনা নয়। ইফ্ ইউ হ্যাভ্ নো মেমারি—এমনটিই হবে। এ-জগৎ শূন্য হয়ে যাবে তোমার কাছে। একেবারেই শূন্য। তোমার মা থাকবেন না, ফুল, বই, পাখি, গান—ছেলেবেলা, তোমার বাবার স্মৃতি—শত শত ছোট ছোট সুখের অভিজ্ঞতা, আনন্দ। এটাই কি তুমি চাও?'

'না।'

'কেউ চাইবে না। আফ্টার অল শূন্য থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। এখন এক দুই ক'রে নয় পর্যন্ত এসেছি। আমরা শুধু আশা করব—পরের শূন্য আসুক,—কিন্তু শুরুর শূন্য নয়, শেষের শূন্য। লেট আস মেক টেন, টুয়েন্টি...'

একটা সাদা বক আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আমি দেখছিলাম।